# মনীষীদের ছাত্রজীবন

প্রিয়নাথ জানা

ছাত্রজীবন সংগঠন, আমাদের বিদ্যাসাগর, বঙ্গীয় জীবনীকোষ, জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা, এভারেস্ট কাহিনী, ছোটদের ভূগোল পরিচয়, সাম্ অব্ আওয়ার নেশন বিল্ডার্স প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, প্রখ্যাত প্রবন্ধকার, 'গ্রন্থবাণী' পত্রিকার সম্পাদক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরূপে তাম্রপত্রপ্রাপ্ত

পঞ্চম সংস্করণ : দশম মুদ্রণ

মাতৃভাষা পরিষদ

## উৎসর্গ

বাংলার কিশোর কিশোরীদের হাতে
যারা এই গ্রন্থ-বাণীর আদর্শে
জীবন গড়ার প্রেরণা পাবে

**তুমিও যে হতে পার মনীষী মহান্**

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়, তোমাদের নিত্য পরিচয়
তাঁদের সম্মানে মান নিয়ো, বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হবো বরণীয়।
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## পরিচয়

অধুনা-লুপ্ত "গ্রন্থবাণী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রিয়নাথ জানা মহাশয়ের রচিত "মনীষীদের ছাত্রজীবন" একখানা অতি মূল্যবান ও উপাদেয় গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ পঁচিশজন বঙ্গমনীষীর বাল্য ও ছাত্রজীবন আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সহজ, সরল ভাষায় এবং সুললিত ভঙ্গীতে গ্রন্থকার প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়াছেন। রচনা নৈপুণ্যে উল্লিখিত মহাপুরুষগণের জীবনালেখ্যের এই বিশেষ দিক্‌টি অতি সুন্দর ও অন্তরঙ্গভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনাগুলি সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী।

উনবিংশ শতক বাংলার ইতিহাসে এক মাহেন্দ্র যুগ। বহু প্রতিভাধর অনন্য পুরুষ এই যুগে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল মনীষিগণ জীবনের বিভিন্ন দিকে দিক্‌পালস্বরূপ ছিলেন। ইঁহাদের মনীষা ও কীর্তি মানুষের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের গৌরবে সারা দেশ আজ গৌরবান্বিত। কিন্তু এই সকল মহাপুরুষগণের জীবন-কথা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইলেও ইঁহাদের বাল্য-জীবনের ও ছাত্র অবস্থার খুঁটিনাটি অনেক ঘটনাই অনেকের অজানা। সুপণ্ডিত ও সুলেখক প্রিয়নাথবাবু সেই স্বল্পজ্ঞাত কাহিনীগুলি বর্তমান কিশোর এবং ছাত্রসমাজকে উপহার দিয়াছেন। ইহার দ্বারা সমাজের মহদুপকার সাধিত হইবে।

আজকাল শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের পাঠাগারের সহিত শিশু ও কিশোর বিভাগ খোলা হইতেছে। এই সকল পাঠাগারে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থখানা রাখা অবশ্যই কর্তব্য।

রাইটার্স বিল্ডিং
কলিকাতা
২১ অক্টোবর, ১৯৬০

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
মুখ্য পরিদর্শক
সমাজ-শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ

## সূচীপত্র

# ছাত্রজীবনের সংকল্প

আমি ছাত্র। অধ্যয়নই আমার সাধনা, আমার তপস্যা। পড়ার বিষয় খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ব। সবকিছু ভাল করে শিখব। অবসর সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাল ভাল বই পড়ে জ্ঞানার্জন করব। দেহ-মন সুস্থ রাখতে শরীর-চর্চা করব। শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কাজে লিপ্ত হব না। অবশ্য বিপন্নের সেবায় সহায়তা করব।

ছাত্রজীবনে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন। আমি সর্বপ্রযত্নে মনীষী-মহাপুরুষদের জীবনাদর্শে আমার চরিত্র গঠনের চেষ্টা করব। জগতে যা-কিছু সৎ তা-ই গ্রহণ করব, যা অসৎ তা বর্জন করব। সর্বক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলব। শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখব। পিতা-মাতা, শিক্ষাদাতা প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল হব।

আমি ভারতবাসী। ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, আমার মাতৃভূমি। মাতৃভূমির কল্যাণই আমার কল্যাণ। আমি আজীবন আমার মাতৃ-ভূমির কল্যাণ-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করব। আমি মাতৃভূমির দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে ও পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে যত্নবান হব। বহু শহীদের আত্মদানে অর্জিত স্বদেশের স্বাধীনতা, ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণে সর্বদা সজাগ থাকব। স্বাধীনতা আমার জন্মগত সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার, স্বাধীনতা আমার প্রাণবায়ু।

আমার পরমারাধ্যা পরম প্রিয় স্বদেশজননী সুমহান্ ভারতের শাশ্বতবাণী—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। আমি সারা বিশ্বের সকল মানুষকে ভালবাসব। দেশে দেশে মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র ও সম্প্রীতি সংবর্ধনে সর্বদা সর্বতোভাবে সহায়ক হব।

সকল যুগের সকল দেশের ছাত্রসমাজের আদর্শ
মানবতার মহান পূজারী বীর পুরুষ বিদ্যাসাগর
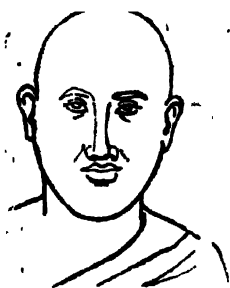
# বোপদেব গোস্বামী

"পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা।
পার কিনা পার কর যতন আবার, একবার না পারিলে দেখ শতবার।"

একটি বিষণ্ণ বালক। একদিন ভরদুপুরে এক পুকুরের পাড়ে শান-বাঁধানো ঘাটে এসে বসেছে। ব্যাকরণের পাঠ মুখস্থ করতে পারে না বলে টোলের গুরুমশাই তাকে প্রায়ই বকুনি দেন। সেদিনের বকুনির মাত্রাটা ছিল কিছু বেশী এবং পিঠেও পড়েছিল দু-চার ঘা বেত। আর গুরুমশাই ধমক দিয়ে বলেছিলেন—পড়া তৈরী করতে না পারলে টোলে আসবি না, তোর মতো নিরেট গাধা ছেলের আমার দরকার নেই।

গুরুর তিরস্কার ও প্রহারের যাতনায়, মনের দুঃখে, ক্ষোভে ও লজ্জায় ছেলেটি চুপি চুপি টোল থেকে পালিয়ে এসে ঘাটে বসে সাত-পাঁচ ভাবছিল। গুরুমশাই তো তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এদিকে বাড়িতেও মা-বাবা অসন্তুষ্ট। এ অবস্থায় এখন সে কি করবে। সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কখনো ভাবছে সে সত্যই কি এমন বোকা যে তার দ্বারা কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। অন্য সব ছেলে যা করতে পারে, সেই বা কেন পারবে না? তার মাথাটা কি এতোই নিরেট?

চিন্তায় ভাবনায় দীর্ঘ সময় কেটে গেল ঘাটে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। এর মধ্যে গ্রাম-গ্রামান্তরের বহু নারী-পুরুষ ঘাটে স্নান করে যাচ্ছে। মেয়েরা আসছে শূন্য কলসী কাঁখে নিয়ে। যাবার সময় জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে। স্নান করার আগে মেয়েরা জল ভরে কলসীটা ঘাটের পাথরের উপর বসিয়ে রাখছে। স্নান সেরে কলসী কাঁখে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ বালকের নজরে পড়ল—মেয়েরা যেখানে কলসী বসিয়ে রাখছে সেখানকার পাথর ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গর্তের মতো হয়ে গেছে। এইভাবে একাধিক গর্ত সে দেখতে পেল। সে তখন ভাবতে লাগল—এতো শক্ত পাথর, তাও

ক্ষয়ে যায় কলসীর ঘষায়। এ তো বড় আশ্চর্যের বিষয়। ব্যাপারটা ভারী সুন্দর লাগলো বালকের কাছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গর্তগুলোর দিকে। আর আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবতে লাগল।

তার খালি মনে হতে লাগল—বার বার ঘষার ফলে শক্ত পাথরও যখন ক্ষয়ে যায়, তখন জগতে তো অসাধ্য বলে কিছুই নেই। বার বার চেষ্টা করলে তো যে-কোনো কাজই করা যেতে পারে, তা যতোই কঠিন হোক না কেন। এই যে আমি পড়ে কিছু মনে রাখতে পারছি না, কিন্তু বার বার করে যদি পড়ি, একবারের জায়গায় যদি দশবার, বিশবার কিংবা একশোবার পড়ি, তাহলে মনে থাকবে না কেন? যেই ভাবা সেই কাজ। বালক ধীরে ধীরে উঠে বাড়ির দিকে চলল এবং বাড়ি পৌঁছেই পুঁথিপত্র নিয়ে পড়তে বসে গেল। ঘরের মধ্যে খিল এঁটে এবং আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে বালক গভীর মনোযোগের সঙ্গে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করতে লাগল। বড় কঠোর সংকল্প নিয়েছিল বালক—পাঠ মুখস্থ না-করে উঠবে না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে বারবার পড়ার ফলে তার সংকল্প সিদ্ধ হল। ব্যাকরণের সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ হয়ে গেল।

পরদিন বালক প্রসন্ন মনে গুরুমশাইয়ের টোলে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে ক্ষমা চাইল এবং পাঠ আবৃত্তি করল। গুরুমশাই খুব খুশী হয়ে বালককে ক্ষমা করলেন এবং তারপর নিয়মিত পাঠ দিতে লাগলেন। বালকের অভাবনীয় উন্নতি দেখে তিনি যারপরনাই বিস্মিতও হলেন।

কে এই অধ্যবসায়ী উদ্যোগী বালক? ইনিই পরবর্তীকালের বিখ্যাত পণ্ডিত, ব্যাকরণবিশারদ বোপদেব। পুরো নাম বোপদেব গোস্বামী—বাংলার সোনার ছেলে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিখ্যাত 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' এঁরই রচনা। খ্রীস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ইনি জীবিত ছিলেন। এঁর পিতা কেশব গোস্বামী ছিলেন প্রখ্যাত ভিষক্ অর্থাৎ চিকিৎসক। নিবাস ছিল উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলার সুপ্রাচীন মহাস্থানগড়।

বোপদেব কেবল মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই রচনা করেননি। সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ, বোপদেবশতক, কাব্যকামধেনু, হরিলীলা প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে অমর হয়ে আছেন। আর চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর বাল্যের ছাত্রজীবনের কঠোর সংকল্প ও অধ্যবসায়ের অক্ষয় কাহিনীর মধ্যে।

## শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

"বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া"

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। নবদ্বীপে জন্মেছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভাবান ছাত্র। বালকের বিদ্যার গভীরতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে ছাত্র, শিক্ষক ও জনসাধারণ সকলেই খুব অবাক হতেন। অধ্যয়নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত একাগ্রমনা। কোনো বিষয় একবার মাত্র পাঠ করলে বা শুনলেই তাঁর শেখা হয়ে যেত। তিনি ছাত্রাবস্থায় ন্যায়শাস্ত্রের এক বিখ্যাত গ্রন্থের উপর একখানা টীকা রচনা করেছিলেন। একদিন তাঁর এক মেধাবী সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে নৌকোয় গঙ্গা পার হচ্ছিলেন। ঐ সময় শাস্ত্রাদি আলোচনা করতে করতে নিজের লেখা বইটির কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সহপাঠীর চোখে দেখা গেল জল। তা দেখে প্রথম ছাত্রটি কিছু বিস্মিত হলেন। তিনি কৌতূহলে এবং সস্নেহে বার বার এর কারণ জানতে চাইলে তাঁর গুণমুগ্ধ সতীর্থ বললেন, 'ভাই, বহু দিন ধরে বহু পরিশ্রম করে আমিও ঐ গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করেছি। কিন্তু তোমার রচনা শুনে মনে হল, তোমার গ্রন্থখানি প্রচার হলে আমার গ্রন্থ আর কেউ পড়বে না।' সহপাঠী বন্ধুর দুঃখের কথা শুনে ঐ অসাধারণ ছাত্রটি হাসতে হাসতে তৎক্ষণাৎ নিজের লেখা বইটি অবহেলায় গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করলেন এবং বন্ধুকে তাঁর নিজের বই প্রচারে খুবই উৎসাহ দিলেন।

সেদিনের সেই অসাধারণ ছাত্রই পরবর্তীকালের অসাধারণ মানুষ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রেমধর্ম প্রচারক লোকত্রাতা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব। চব্বিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ ও ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম—প্রেমের ধর্ম। এ ধর্মে মানুষে মানুষে কোনো বিভেদ নেই। সকল মানুষই এক ও অভিন্ন। তাঁর প্রেমধর্ম সেদিন বাংলায়

অধঃপতিত সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তিনি মাত্র আটচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সারা বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল।

প্রায় পাঁচশো বছর আগে ৮৯১ বঙ্গাব্দে (খ্রীঃ ১৪৮৫) ফাল্গুন মাসের দোল-পূর্ণিমার দিন রাত্রির প্রথম প্রহরে নদীয়া জেলার নবদ্বীপে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। তাঁর একাধিক নামকরণ হয়। জগন্নাথ মিশ্র নাম রাখেন 'বিশ্বম্ভর'। বাড়ির উঠোনের মধ্যস্থ নিমগাছের তলায় জন্মান বলে শচীদেবী আদর করে ডাকতেন 'নিমাই'। এই নিমাই নামেই তিনি নবদ্বীপবাসীর নিকট সমধিক পরিচিত। তাঁর দেহ ছিল দেবতুল্য অতি মনোহর এবং গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তাঁর অঙ্গের এই গৌরবর্ণের জন্য আখ্যা হয়েছিল 'গৌরাঙ্গ' বা 'গোরা। আবার 'হরিবোল' বললেই বালক আনন্দে উল্লসিত হয়ে 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলে সুন্দর নৃত্য করতেন। এজন্য আত্মীয়-স্বজনরা ডাকতেন 'গৌরহরি'। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' সংক্ষেপে 'চৈতন্যদেব' এবং পরবর্তীকালে এই নামেই তিনি ভুবন-বিদিত হন।

নিমাই পাঁচ বছরের হলে জগন্নাথ মিশ্র এক শুভদিনে তাঁর হাতে-খড়ি দিয়ে গ্রামের গুরুমশাই সুদর্শন ওঝার পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। বালক এতোই প্রতিভাবান যে দেখামাত্রই, অক্ষরসমূহ লিখে ফেলতে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সব অক্ষর শেখা হয়ে গেল দেখে ওঝার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অধ্যয়ন-শেষে বালক নিমাই সঙ্গী-সাথী ও সহপাঠীদের নিয়ে খেলাধূলা ও রঙ্গরসে মত্ত থাকতেন। একটি খেলা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। সঙ্গীদের নিয়ে মণ্ডলী রচনা করতেন এবং নিজে তার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তালে তালে হাততালি দিয়ে সুমধুর স্বরে 'হরি বোল', 'হরি বোল' বলে নৃত্য করতেন। সঙ্গীরাও আনন্দে পুলকিত হয়ে তাঁকে বেড়ে বেড়ে নৃত্য করত।

অধ্যয়নে বালক নিমাইয়ের দ্রুত উন্নতি দেখে সকলেই আনন্দিত; কিন্তু শঙ্কিত হলেন পিতা জগন্নাথ মিশ্র। কারণ, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ খুব বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ছিলেন। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাঁর মনে সংসার বৈরাগ্য দেখা দেওয়ায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য ষোল বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। বেশি পড়াশোনা করলে নিমাইও না বিশ্বরূপের মতো গৃহত্যাগ করে

বসেন এই ভেবে সকলের আপত্তি সত্ত্বেও জগন্নাথ মিশ্র তাঁর পড়াশোনা বন্ধ করে দিলেন।

পাঠশালা যাওয়া ও পড়াশোনা বন্ধ হওয়ায় নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর দৌরাত্ম্যে মা শচীদেবী ও পাড়া প্রতিবেশী সকলে সদাই অস্থির। শেষে সবাই মিলে জগন্নাথ মিশ্রকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিমাইকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। আবার পড়তে পেয়ে নিমাই খুব খুশী। এবারে পড়াশুনোয় তিনি আগের চেয়েও বেশ মনোযোগী হলেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হলে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হয়ে ব্যাকরণ পড়তে লাগলেন। গঙ্গাদাস ব্যাকরণের খুব বড় পণ্ডিত। নিমাইয়ের অপূর্ব মেধা দেখে পণ্ডিত তো অবাক। অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে নিমাই ব্যাকরণ-শাস্ত্র শেষ করলেন। তারপর সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তৎকালীন খ্যাতনামা অধ্যাপক মহেশ্বর বিশারদের টোলে ভর্তি হলেন। শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখে সহপাঠিগণ, অধ্যাপকবৃন্দ ও পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই স্তম্ভিত হলেন। ন্যায়ের তর্কযুদ্ধে ছাত্র নিমাই সকলকে পরাজিত করতে থাকেন। এমন কি অধ্যাপকরাও রেহাই পেতেন না। হাটে-মাঠে-বাটে-গঙ্গার ঘাটে—যেখানেই যখন কোন পড়ুয়া বা পণ্ডিত দেখেন, তখনই তাঁকে ন্যায়ের কূট-বিষয় জিজ্ঞেস করে নাজেহাল করেন। কেউ তাঁর সঙ্গে তর্কে বড় একটা এঁটে উঠতে পারতেন না। শেষে নিমাই অনেকের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক সময় দূর থেকে নিমাইকে দেখতে পেলে যাতে তাঁর মুখোমুখি হতে না হয়, এজন্য তাঁরা পথ ছাড়িয়ে অন্য দিকে চলতেন। অবশ্য সকলেই মনে মনে পড়ুয়া নিমাইয়ের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করতেন।

গুরু বিশারদের টোলে পড়া শেষ করে ষোল বছর বয়সে নিমাই নবদ্বীপে নিজেই একটি টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। ভাল অধ্যাপক ও পণ্ডিত বলে শীঘ্রই তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট এসে ভীড় জমাতে থাকে। অল্প বয়সেই তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন। সর্বসাধারণের কাছে তরুণ নিমাই 'নিমাই পণ্ডিত' নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

# রঘুনাথ শিরোমণি

"ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি"

গরীব বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। বয়স পাঁচ বছর। উনুন ধরাবার জন্য মা একদিন ছেলেকে পাঠালেন নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে আগুন আনতে। ছেলেটি টোলে পৌঁছে 'আগুন দাও, আগুন দাও' বলে বার বার চেঁচাতে লাগল। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব তখন ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। বালকের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে টোলের একটি ছাত্র উঠে গিয়ে একখানা হাতায় করে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে এসে বলল, 'কিসে [illegible] নিবি নে।' বালকের হাতে তখন কিছুই ছিল না। [illegible] ঘুঁটের একদিকে ধরিয়ে তার হাতে দেবে এই [illegible] নিমাই পাঁচ বছ[illegible] [illegible] করেই সে খালি হাতে গিয়েছিল। কিন্তু তার প্রতি বিরক্ত প্রকাশ করে ছাত্রটি যখন অঙ্গার দিতে গেল, তখন ছেলেটি একটুও ঘাবড়াল না। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ এক অঞ্জলি ধুলো তুলে নিয়ে বলল, 'এই যে দাও'। ধুলোর উপর অঙ্গার নিয়ে ছেলেটি চলে গেল। বাসুদেব আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করছিলেন। বালকের অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলেন। ভাবলেন এর দ্বারা কোন অসাধারণ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বিধবা মাকে ডেকে এনে কথাবার্তা কয়ে ছেলেটির পড়ার ও ভরণপোষণের ভার নিলেন।

কে এই অসাধারণ বুদ্ধিমান বালক ?

ইনিই পরবর্তীকালের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমণি। ন্যায়শাস্ত্রে তৎকালীন ভারতে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইনিই টোল খুলে নবদ্বীপকে সারা ভারতের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। ন্যায়-শাস্ত্রে ইনি বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ছাত্রজীবনে ইনি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সতীর্থ ছিলেন।

১৪৫৫-৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রঘুনাথ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবিন্দ চক্রবর্তী, মাতা সীতাদেবী। বাল্যে পিতা মারা গেলে মায়ের সঙ্গে নবদ্বীপে আসেন।

যথাসময়ে সার্বভৌমের টোলে বালক রঘুনাথের পাঠ আরম্ভ হল। এমন পাঠও কেউ কখনো দেখেনি। শুরু থেকেই অজস্র চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নে বাসুদেবের মতো মহাপণ্ডিতকে হিমসিম খাইয়ে দিতে লাগলেন। ক খ শেখাতেই রঘুনাথ কোট ধরলেন ক আগে কেন? খ আগে নয় কেন? বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুটি জ (জ ও য), দুটি ব, দুটি ন (ণ ও ন) এবং তিনটি স (শ ষ ও স)—এ সমস্তেই বালক রঘুনাথ আপত্তি তুললেন।

বালককে বর্ণমালা শেখাতেই সার্বভৌম মশাইকে ব্যাকরণের অর্ধেক সূত্রের উল্লেখ করতে হয়েছিল। বালকের স্মৃতিশক্তি যেমন তীব্র, বিচার-শক্তিও তেমনি ক্ষুরধার। কোনো কথা একবার শুনলেই মনে গাঁথা হয়ে গেল। প্রশ্নবাণে বিব্রত করলেও অধ্যাপকমশাই অত্যন্ত আনন্দ ও যত্নের সঙ্গে রঘুনাথকে পাঠ দিতে লাগলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান ও স্মৃতি শেষ করে রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করলেন। দিনের বেলায় যা পাঠ হত, রাত্রে তা লিখে তাতে তর্ক-বিষয়ক কোন ত্রুটি পেলে রঘুনাথ তার সামঞ্জস্য করে পরদিন নিজের মত গুরুকে শোনাতেন। এইভাবে তর্কশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা জন্মাল। বাসুদেব নিজের সমস্ত বিদ্যা রঘুনাথকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগলেন। রঘুনাথ 'নিরুক্ত' নামক টীকার ত্রুটি গুরুকে দেখালে তিনি বিশেষ প্রীত হন। সার্বভৌমের টোলে শিক্ষা শেষ হলে বাসুদেব রঘুনাথকে উচ্চ শিক্ষার জন্য ন্যায়বিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র মিথিলায় পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল রঘুনাথকে দিয়ে মিথিলার পণ্ডিতদের তর্কে পরাজিত করে নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করা। তাছাড়া, তখন মিথিলার কোন পুঁথি কোন বিদেশী ছাত্রকে নকল করে আনতে দেওয়া হত না। রঘুনাথকে পাঠালেন মিথিলার সমস্ত শাস্ত্র মুখস্থ করে আনতে।

রঘুনাথ মিথিলায় পৌঁছে সেখানকার সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের অধীনে অধ্যয়ন শুরু করলেন। পক্ষধর মিশ্রের নিয়ম ছিল দেওয়ালের দিকে মুখ করে তিনি ছাত্রদের পড়াতেন এবং টীকা লিখতে লিখতেই ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কোনো ছাত্র তাঁকে তর্কে বিশেষ-

ভাবে তুষ্ট করলে তবে তিনি মুখ ফিরিয়ে বিচার করতেন। পক্ষধর মিশ্রের টোলে যে কজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল, কিছুকালের মধ্যে রঘুনাথ তাদের সকলকে তর্কে পরাজিত করলে পক্ষধর বিশেষ প্রীত হন এবং বরাবরই তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে পাঠ দিতে থাকেন। অল্পকাল মধ্যেই রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে পক্ষধর মিশ্রের 'সামান্য লক্ষণা' গ্রন্থের দোষ ধরে গুরুর সঙ্গে বিচার আরম্ভ করলেন। তর্কশাস্ত্র মানসিক কুস্তি। এতে গুরু-শিষ্যে তর্কাতর্কিতে কোন দোষ নেই। একবার পক্ষধরের সঙ্গে ঘোরতর তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হলে মিথিলার নানা স্থান থেকে বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও ছাত্র আসতে আরম্ভ করলেন। তর্কের সঙ্গে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাদিও চলতে লাগল।

তর্ক-সংগ্রামে রঘুনাথ সুস্পষ্টরূপে পক্ষধরের মত খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। কিন্তু পক্ষধর রঘুনাথের মত অকাট্য বুঝেও সরল মনে পরাজয় স্বীকার করতে পারলেন না। রঘুনাথের এক চোখ কানা ছিল। তিনি তাঁকে কানা, নির্বোধ, নাস্তিক, বেল্লিক প্রভৃতি শব্দে অপমানিত করতে লাগলেন। উপস্থিত মৈথিল পণ্ডিত ও ছাত্রগণ চীৎকারে ও গালিগালাজে পক্ষধরের কটূক্তির সমর্থন করতে লাগলেন।

সেদিন কিন্তু এই তর্কযুদ্ধ থেকে রঘুনাথ সমস্ত মিথিলার 'কানা-কানা' চীৎকারের মধ্যে হতমান হয়ে বাসায় ফিরলেন। যখন ধীরভাবে নিজের প্রত্যেকটি কথা স্মরণ করে তিনি বুঝলেন যে তিনি কয়েক দিনের বিচারে একটিও অযৌক্তিক ও অশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেননি এবং তাঁর যুক্তি একান্তই অকাট্য, তখন তাঁর বড়ই ক্রোধের উদ্রেক হল। স্থির করলেন পক্ষধরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আবার বিচাব আরম্ভ করবেন। যদি বিচারে ঠেকে পক্ষধর সরলভাবে পরাজয় স্বীকার করেন তো ভাল, স্বদেশে গিয়ে নিজ-মত প্রচার করবেন; নচেৎ পক্ষধরের এবং নিজের প্রাণ তরবারির আঘাতে বিনষ্ট করে সব শেষ করে ফেলবেন। সেদিন শরৎকালের পূর্ণিমা। পক্ষধরের পত্নী বলছেন, 'এই জ্যোৎস্নার অপেক্ষা নির্মল কিছু আছে কি?' পক্ষধর ততক্ষণে নিজের অসরল ও অন্যায় আচরণে লজ্জিত হয়ে রঘুনাথের কথাই ভাবছিলেন। তিনি বললেন, 'নবদ্বীপ হতে একটি নবীন নৈয়ায়িক এসেছেন। তাঁর বুদ্ধি এ জ্যোৎস্নার অপেক্ষাও নির্মল।'

ঠিক সেই সময় তরবারিহস্তে রঘুনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু

ব্রাহ্মণের ক্রোধ বাঁশ পাতার আগুন। ততক্ষণে তাঁর রাগ পড়ে এসেছিল। তিনি গুরুগৃহে পৌঁছেই অনুতপ্ত হয়ে ফিরবার উদ্যোগ করছিলেন। এই কথাগুলি শুনতে পেয়ে তরবারি ফেলে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে গুরুর চরণতলে গিয়ে পড়লেন এবং অকপটে স্বীকার করলেন যে, যে বুদ্ধির তিনি ( পক্ষধর ) প্রশংসা করছিলেন, সেই বুদ্ধিই তাঁকে তরবারি হস্তে গুরুহত্যার জন্য সেখানে এনেছে। পক্ষধর রঘুনাথকে কাছে পেয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিজের আত্মগ্লানিজনিত বিষম যাতনার কিঞ্চিৎ উপশম করলেন এবং পরদিন সকলকে ডেকে প্রকাশ্য সভায় সুস্পষ্টভাবে নিজের পরাজয় স্বীকার করলেন। এতকাল যে সকল মত অকাট্য ও অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত হয়ে আসছিল তা রঘুনাথের অসাধারণ ধীশক্তিগুণে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। রঘুনাথ ভারতবর্ষের শিরোমণি হলেন। তিনি নবদ্বীপে ফিরে এসে টোল খুললে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্ররা এসে তাঁর নিকট ন্যায়দর্শন শিক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। তারপর বহু কাল পর্যন্ত নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্র চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে অবস্থান করছিল। উল্লেখযোগ্য যে মিথিলার ছাত্রজীবনে রঘুনাথ মিথিলার সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং নবদ্বীপে এসে তা লিপিবদ্ধ করেন।

## রাজা রামমোহন রায়

"নবযুগের উদ্বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন"

আজ থেকে প্রায় দু-শো বছর আগের কথা। পনের-ষোল বছরের একটি কিশোর ছাত্র। বয়সে তরুণ হলেও জ্ঞানে কিন্তু প্রবীণ। ঐ অল্প বয়সেই তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। আমাদের দেশে তখন বহু কু-প্রথা প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস প্রথা ছিল 'সতীদাহ'—মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত বিধবা স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা। একদিন ঐ কিশোরের দাদা মারা গেলেন। তখন তাঁর বৌদিকে দাদার চিতায় পুড়িয়ে মারার তোড়জোড় চলল। কিশোর বহু যুক্তিতর্ক দেখিয়ে তাঁর বৌদিকে এ ভাবে 'সতী' না করার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। জোর করে তাঁর বৌদিকে পুড়িয়ে মারল। তখন কিশোর চিতাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি বড় হয়ে এ-দেশ থেকে অমানুষিক সতীদাহ প্রথা দূর করবেন।

কে এই দুঃসাহসিক কিশোর যিনি বহু যুগ-প্রচলিত একটি ভয়াবহ কু-প্রথার বিরুদ্ধে শপথ-বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন ?

ইনিই নব-জাগরণের প্রথম নেতা ভারতের কুসংস্কারের মুক্তিদাতা রাজা রামমোহন রায়। প্রথমেই তিনি দেশের ধর্ম সংস্কারে হাত দেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে নতুন যুগের সূচনা করেন। রাজা রামমোহন পরিণত বয়সে সতীদাহ-প্রথা দূর করে ছাত্রজীবনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া, আরও বহু কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। ইনি বাংলা গদ্যেরও প্রবর্তক। ভারতের কল্যাণের জন্য ইনি বহু কাজ করে গিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা ইনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ উপাসক।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের ( মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ ) ২২ মে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন।

এঁদের কৌলিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাব 'রায়' পদবী দেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ। আর মাতা তারিণী দেবী ( ডাক নাম ফুল-ঠাকুরানী ) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও ধর্মপরায়ণা রমণী।

বাল্যে গ্রামের এক গুরুমশাই-এর পাঠশালায় রামমোহনের বিদ্যারম্ভ হয়। তাঁর অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি এবং প্রখর স্মৃতিশক্তি বিস্ময়ের বিষয় ছিল। কোন বিষয় দু-একবার পড়লেই তাঁর সব মনে গেঁথে যেত। তা আর কখনো ভুলতেন না। এই স্মৃতিশক্তির মূলে ছিল তাঁর মনের একাগ্রতা। তিনি যখন যে-কোনো কাজ করতেন তা গভীর আগ্রহের সঙ্গে এক মনেই করতেন।

সরকারী কাজের জন্য এখন যেমন ইংরেজি ভাষা শিখতে হয়, তখন সেইরূপ আরবী পারশী শিখতে হত। ইংরেজ সবেমাত্র এ-দেশ অধিকার করেছে, ইংরেজি তখনো চালু হয়নি। রামকান্ত পুত্র রামমোহনকে খুব ভাল করে আরবী পারশী শেখবার জন্য মাত্র ন-বছর বয়সে পাটনায় পাঠালেন। সেখানে দু-তিন বছরের মধ্যে তিনি ঐ দুই ভাষা বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করলেন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। ঐ সময় তিনি মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরান পড়ে শেষ করেন। পাটনায় অনেক বড় বড় মৌলভীর সঙ্গে ইসলাম ধর্ম নিয়ে তাঁর আলোচনা হত। বালক রামমোহনের জ্ঞানের গভীরতা এবং যুক্তি, তর্ক ও বিচারশক্তি দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যেতেন। পাটনায় থাকাকালে রামমোহন কবি হাফেজ, মৌলানা রুমি, শামী, তাব্রিজ, শেখ সাদি ও ওমর খৈয়াম প্রভৃতি বিখ্যাত পারস্য কবিদের অমর কাব্য গ্রন্থসমূহ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। ফলে এঁদের বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

বার বছর বয়সে আরবী পারশী শিখে বাড়ি ফিরে এলে রামকান্ত রামমোহনকে ভাল সংস্কৃত শেখাবার জন্য কাশী পাঠালেন। সেখানেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা খুব ভাল করে শিখলেন এবং প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করে গভীর জ্ঞান অর্জন করলেন। ষোল বছর বয়সে রামমোহন বাড়ি ফিরে আসেন।

বিভিন্ন ভাষায় বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে ঐ ছাত্রজীবনেই কিশোর রামমোহনের মনে ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় এবং প্রচলিত ধর্মাচরণের

প্রতি সন্দেহ জন্মে। শেষে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই সকল ধর্ম ও সকল শাস্ত্রের মূল নীতি। তখন সমাজে বহু দেবদেবীর পুজো হত এবং ধর্মের নামে নানা অনাচার, কু-আচার চলত। রামমোহন বহু দেবদেবী ও মূর্তি পুজোর বিরূদ্ধে মত প্রকাশ করেন। পিতা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। ধর্ম নিয়ে পিতা-পুত্রে গভীর আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হত। ঐ সময় রামমোহন প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে একখানি বই লেখেন। বইটির নাম "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী।" তিনি এতে হিন্দুদের দেবতার নামে পুতুল পুজোর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। অতি অল্প বয়সের একটি ছাত্রের পক্ষে এরূপ বই লেখা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। পুত্রের এই নতুন ধর্মমত প্রচারে পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হন। এজন্য রামমোহন এ সময় বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার জন্য তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহ পড়ার জন্য তিনি ঐসব ভাষা শিখলেন। সারা দেশ ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে দেশের অবস্থা খুবই খারাপ এবং এর কারণ বিদেশী শাসন। তখন ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা জন্মে। ঐ সময় দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার চিন্তা তাঁর মনে প্রবল আকার ধারণ করে। অবশেষে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন এবং চির তুষারাবৃত উচ্চ হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিব্বতে গিয়ে পৌঁছান। ঐ ভ্রমণ একটি ষোল বছর বয়সের বালকের পক্ষে অতি আশ্চর্যের বিষয় ছিল। তখন এক ইংরেজ সাহেব বলেছিলেন যে, যদি রামমোহন জীবনে আর কিছু না করতেন শুধু এই দুঃসাহসিক অভিযানের জন্যই বিখ্যাত হয়ে থাকতেন। তখন এ যুগের মতো ভাল রাস্তাঘাট ছিল না। ছিল না উপযুক্ত যানবাহন। সারা দেশ বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পথে চোর-ডাকাত এবং হিংস্র জন্তুরও ভীষণ ভয় ছিল। যে-কোন মুহূর্তেই প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল। এইরূপ অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ষোল বছরের বালক রামমোহন হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে তিব্বতে পৌঁচেছিলেন। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও দুঃসাহসী ছিলেন। ভয় কি জিনিস তা তিনি জানতেন না। তাঁর দেহও ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। জ্ঞানলাভের জন্য গভীর অধ্যয়নে মগ্ন থাকলেও শরীর চর্চার কথা

তিনি কখনো ভুলতেন না। শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতেন।

রামমোহন তিব্বতে গিয়ে দেখলেন যে সেখানেও ধর্মের নামে নানা গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও ব্যভিচার আছে। সে সবের বিরুদ্ধে তিনি জোর প্রতিবাদ করলেন। তখন তিব্বতীরা অনেকে ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করল। কয়েকজন তিব্বতী রমণীর চেষ্টায় তাঁর জীবন রক্ষা পায়। সেই থেকে রামমোহন নারীজাতিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

চার বছর দেশ-বিদেশের বহু স্থান ভ্রমণ করে এবং অগাধ অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিশ বছর বয়সে রামমোহন বাড়ি ফিরে আসেন। পিতামাতা খুব খুশী হয়ে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। রামমোহন বাড়িতে বসে সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেন এবং বেদ, পুরাণ ও উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু ধর্ম নিয়ে পিতার সঙ্গে আবার মতভেদ হয়। রামমোহন সমাজের সমস্ত কু-প্রথা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পিতা তাঁকে আবার বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। রামমোহন এবার কাশী গিয়ে বারো তেরো বছর ধরে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন। এই সময় তিনি কাশীর বহু বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে ধর্ম ও শাস্ত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তির কাছে পণ্ডিতেরা পরাজিত হতেন।

অধ্যয়নে রামমোহনের গভীর অনুরাগ ছিল এবং পড়ায় এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট বিরাট গ্রন্থ পড়ে শেষ করে ফেলতেন। তাঁর মন ছিল অত্যন্ত সংযত। পড়ার সময় আহার-নিদ্রা ও বাইরের সব বিষয় ভুলে যেতেন। একবার সংস্কৃত ভাষায় লেখা সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ ঘরের দরজা বন্ধ করে সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে পড়ে শেষ করেছিলেন।

রামমোহন অনেকগুলি ভাষা খুব ভালভাবেই শিক্ষা করেছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, পারশী, উর্দু, হিন্দী, বাংলা, ইংরেজি, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এই সকল ভাষার সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে দেশ-বিদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিস্মিত হতেন। ছাত্রজীবনের কঠোর সাধনাই রামমোহনকে পরবর্তী জীবনে বিরাট ও মহান করেছিল।

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

'বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর"

মাত্র আট বছরের একটি ছেলে প্রতিবেশী আনন্দরামের কাঁধে চড়ে হাঁটা-পথে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা চলেছেন ভাল লেখাপড়া শেখার জন্য। সঙ্গে আছেন তাঁর পিতা ও গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। যেতে-যেতে পথের ধারে বাটনা-বাটা শিলের মতো একটা জিনিস হঠাৎ বালকের চোখে পড়ল। কৌতূহলী বালক পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন—বাবা, বাটনা-বাটা শিলের মতো ওটা কি?

মৃদু হেসে পিতা উত্তর দিলেন—ওটার নাম 'মাইল-স্টোন'।

বালক—ওগুলো রয়েছে কেন?

পিতা—ওগুলো থেকে রাস্তার দূরত্ব জানা যায়। প্রতি এক মাইল বা আধ ক্রোশ অন্তর অন্তর ও-ধরনের পাথর পোতা আছে।

বালক—আচ্ছা বাবা, ওর গায়ে কি লেখা আছে?

পিতা—ওর গায়ের লেখাটা হচ্ছে ইংরেজি সংখ্যা।

পথ চলতে চলতে বালক মাইল-স্টোনগুলি দেখে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি সব নির্ভুল শিখে ফেললেন। গুরু কালীকান্ত বালকের এই অদ্ভুত মেধা দেখে তো অবাক। বললেন,—এ তো সাধারণ ছেলে নয়! বেঁচে থাকলে এ ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে।

কে এই অসাধারণ মেধাবী বালক?

ইনি আর কেউ নন, ইনি আমাদের সকলের অতি পরিচিত, পরমপূজ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এঁর লেখা বর্ণ-পরিচয় দিয়েই আমাদের লেখাপড়া শুরু হয়। এ দেশে নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি দেশের বহু ভাল কাজের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় তাঁর বিশেষ দান আছে।

আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্য তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন। পরের দুঃখে তিনি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করতেন এবং সকলকে সাহায্য করতেন। এজন্য তাঁকে 'দয়ার সাগর'ও বলা হয়।

১২ আশ্বিন ১২২৭ বঙ্গাব্দে (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। তাঁর পুরো নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রজীবনে নানা বিষয়ে অগাধ জ্ঞানলাভের জন্য পড়ার শেষে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন এবং সেই থেকে এই 'বিদ্যাসাগর' নামেই তিনি অধিক পরিচিত। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস ছিলেন সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান, স্বাধীনচেতা ও অধ্যবসায়ী পুরুষ। আর ভগবতী দেবী ছিলেন অত্যন্ত দয়াবতী, পরদুঃখকাতরা রমণী। বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা। পিতা, পিতামহ ও মাতার সব গুণই পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের জন্মের পর তাঁকে 'এঁড়ে বাছুর' আখ্যা দিয়ে রামজয় বলেছিলেন—এ ছেলে এঁড়ের মতোই একগুঁয়ে হবে, এর দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি পাবে।

বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের একটি পাঠশালা ছিল। পাঁচ বছর বয়সে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে সেখানে ভর্তি করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী বালক। কোন বিষয় একবার পড়লে বা শুনলেই তাঁর শেখা হয়ে যেত। তাঁর হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। গুরুমশাই অন্য সব ছাত্রদের ডেকে বলতেন—তোরা কি সব হিজিবিজি লিখিস্। ঈশ্বরের লেখা দেখ্ দেখি—কেমন মুক্তোর মতো পরিষ্কার ঝর্ ঝরে। কালীকান্ত ঈশ্বরের বিদ্যাবুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে বলতেন—এ ছেলে একদিন খুব বড় হবে।

ঠাকুরদাস কলকাতায় সামান্য মাইনের একটি চাকরি করতেন। থাকতেন বড়বাজারে এক ধনীর বাড়িতে। ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজের কাছে রেখে ভালভাবে লেখাপড়া শেখাবার জন্য আটবছর বয়সে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং বড়বাজারে তাঁর বাসার পাশের এক পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। ঐ পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র তিন মাসের মধ্যে সব পাঠ শেষ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রখর বুদ্ধি দেখে শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস অবাক হয়ে বলেছিলেন—এ বালক কালে বিরাট হবে।

মাত্র ন-বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। তিনি কলেজে যা শিখে আসতেন, প্রতিদিন রাতে পিতার কাছে তা মুখস্থ বলতে হত। এতটুকুও ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। ঠাকুরদাস তাঁকে বহু উদ্ভট শ্লোক মুখে মুখে শিখিয়েছিলেন। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে ঠাকুরদাস তাঁকে বেদম প্রহার করতেন। প্রহারের ভয়ে ঘুম পেলে ঈশ্বরচন্দ্র অনেক সময় চোখে সরষের তেল লাগিয়ে নিতেন। শোনা যায় তিনি নাকি কখনো কখনো মাথার টিকিতে দড়ি বেঁধে দড়ির অপর দিকটা খুঁটিতে জড়িয়ে পড়তে বসতেন। ঘুম পেলে দড়ির টানে জেগে উঠতেন।

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সকলের সেরা ছাত্র। ব্যাকরণে তাঁর বিরাট দখল দেখে শিক্ষকরা অবাক হয়ে যেতেন। ছ-মাস পরে একটি পরীক্ষা হল। ঈশ্বরচন্দ্র তাতে প্রথম হয়ে মাসে পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পেলেন। ছাত্রজীবনে তাঁর সংকল্প ছিল সকলের সেরা ছাত্র হওয়া। কোন ছাত্র তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, এ তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। এজন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতেন। অধ্যয়ন ছিল তাঁর কাছে তপস্যা।

বারো বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়তে যান। তখন ঐ কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। তিনি প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্য-শ্রেণীতে ভর্তি করতে রাজী হননি। বলেছিলেন—এইটুকু ছেলে সংস্কৃত সাহিত্য কি বুঝবে? এতে ঈশ্বরচন্দ্রের অভিমান হলো। তিনি বিনীতভাবে বললেন—আমাকে পরীক্ষা করুন। জয়গোপাল কালিদাসের সাহিত্য থেকে একাধিক প্রশ্ন করলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তর শুনে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং আনন্দের সঙ্গে তাঁকে সাহিত্য-শ্রেণীতে ভর্তি করে নেন। সাহিত্য-শ্রেণীতে দু-বছর পড়তে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বছরই বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে অর্থ ও পুস্তক পুরস্কার পেতেন। মেঘদূত, শকুন্তলা, কাদম্বরী, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। বারো বছরের ছেলে সংস্কৃত ভাষায় যখন জলের মতো কথা বলতেন, তখন অধ্যাপকরা অবাক হয়ে শুনতেন। তিনি অতি সুন্দর অনুবাদ করতে পারতেন। তাঁর সংস্কৃত থেকে

বাংলা বা বাংলা থেকে সংস্কৃত অনুবাদ অন্য ছাত্রের ঈর্ষার বিষয় ছিল। তাঁর সুন্দর হাতের লেখার জন্যে তিনি প্রতি বছরই পুরস্কার পেতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। এতো দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁকে লেখাপড়া করতে হত যে শুনলে চোখে জল না এসে পারে না। এতো অভাব ছিল যে অনেকদিন অন্ন জুটত না। যখন জুটত, তখন হয়ত পেট ভরে খেতে পেতেন না। তরকারির অভাবে অনেক সময় শুধু নুন দিয়ে ভাত খেতে হত। লেখাপড়া করার সঙ্গে সঙ্গে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে বাসায় অনেক কাজ করতে হত। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন-চারজনের রান্না করতেন। ঐ সময় তাঁর আরও দু-ভাই এবং এক কাকা এসে কলকাতার বাসায় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সকালে স্নান সেরে বাজার করে আনতেন। তরকারী কোটা, বাটনা বাটা, রান্নার কাঠ চেরাই করা প্রভৃতি সবই তাঁকে করতে হত। অনেক সময় রান্না করতে করতেই পড়তে হত। রান্না হয়ে গেলে সবাইকে খাইয়ে নিজে খেতেন। তারপর বাসন মেজে, ঘর ধুয়ে মুছে কলেজে যেতেন। শোবার জায়গাটিও ছিল অত্যন্ত ছোট। দেড় হাত চওড়া ও দু-হাত লম্বা একটি বারান্দায় ছোট একটি মাদুর পেতে শুতেন। মাথায় দেবার কোন বালিশও ছিল না। থাকার ঘরটিও ছিল অত্যন্ত জঘন্য। তার কোন জানালা ছিল না। দিনেও অন্ধকার হয়ে থাকত। ঘরে নানারকম পোকামাকড়েরও উপদ্রব ছিল। এতো কষ্ট এবং অসুবিধার মধ্যেও ঈশ্বরচন্দ্র গভীরভাবে পড়াশোনা করতেন। বিরক্ত ছিল না কোন কাজে। চরকায় মায়ের হাতে-কাটা সুতোয় তৈরী ছোট মোটা কাপড় ও চাদরই ছিল তাঁর ছাত্রজীবনের পোশাক।

নিজের দারুণ অভাব থাকা সত্ত্বেও, বৃত্তির টাকা থেকে কিছু কিছু দিয়ে সহপাঠী গরীব ছাত্রদের সাহায্য করতেন। কারুর বই কিনে দিতেন, কাউকে দিতেন কাপড় কিনে। দুঃস্থ সহপাঠীর অসুখ করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। নিজে তার সেবা করতেন, এমন কি মল-মূত্রাদিও পরিষ্কার করতেন। কলেজে জল খাবার সময় কোন ছেলে কাছে থাকলে, তাকে কিছু দিয়ে তবে নিজে খেতেন। বাসায় কেউ এলে তাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না।

বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মোটেই শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক ছিলেন না।

যথেষ্ট খেলাধুলা করতেন। দীর্ঘপথ অনায়াসে হেঁটে যেতেন। তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে স্বভাবের ছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁর যথেষ্ট ধৈর্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল। তাঁর আচার-আচরণ ছিল খুবই সুন্দর। তিনি বিনয়, নম্রতা, দয়া, পরোপকারিতা, অমায়িকতা প্রভৃতি নানা মহৎ গুণেরও অধিকারী হয়েছিলেন।

বাবা-মাকে দেবদেবীর ন্যায় ভক্তি করতেন। শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। ছোট ভাই বোনদের প্রতি ছিল অপরিসীম ভালবাসা। ছোট বড় সকল মানুষের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম ছিল। দেশে গেলে প্রথমেই বাল্যগুরু কালীকান্তের বাড়ি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেন। পরে প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে সকলের খোঁজ খবর নিতেন। গ্রামে কারুর অসুখ করেছে শুনলে তার বাড়ি গিয়ে সেবা করতেন। গ্রামে তিনি সকলেরই স্নেহের পাত্র ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র একে একে অলঙ্কার, স্মৃতি, বেদান্ত, ন্যায় ও দর্শন শ্রেণীতে প্রবেশ করে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীতেই প্রথম স্থান অধিকার করে প্রচুর পুরস্কার লাভ করলেন। স্মৃতি পড়তে যেখানে তিন বছর লাগে, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে ছ-মাসে শেষ করেছিলেন ঐ সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু আইনের পরীক্ষা দিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান এবং পুরস্কার পান। ন্যায় ও দর্শন পড়তে অন্য ছাত্রের যেখানে আট-দশ বছর লাগত, ঈশ্বরচন্দ্র তা চার বছরেই শেষ করেন এবং এজন্য বিশেষ পুরস্কারও পান। ন্যায় ও দর্শন শ্রেণীর যখন তিনি ছাত্র, তখন একবার সংস্কৃত কলেজে ছ-মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ খালি হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা দেখে কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব তাঁকেই ঐ পদে ছ-মাসের জন্য নিয়োগ করেন। এজন্য তিনি মাসে চল্লিশ টাকা করে মাইনে পেতেন। তিনি এতো সুন্দর পড়াতেন যে ছাত্র শিক্ষক সবাই মুগ্ধ হতেন।

বিশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তাঁর নানা গুণ, জ্ঞান-বিদ্যা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কলেজের সমস্ত অধ্যাপক মিলে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে তিনি সকলের নিকট 'বিদ্যাসাগর' নামেই সুপরিচিত।

# মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে, মধুহীন বঙ্গভূমি, হইয়াছে এতদিনে।"

পাঁচ-ছ বছর বয়সের একটি ছেলে। রামায়ণের কাহিনী শুনতে বড়োই ভালবাসে। তার মা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করে শোনান। পাঠ শুনতে শুনতে ছেলেটি এমন তন্ময় হয়ে যায় যে আহার নিদ্রা পর্যন্ত সব ভুলে যায়। এক-একদিন অনেক রাত হয়ে গেলে মা বলেন—'আজ থাক খোকা, আবার কাল হবে। ছোট ছেলে, এভাবে রাত জাগলে ও রাত করে খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।' ছেলেটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে কিছুতেই পাঠ বন্ধ করতে দিতে চায় না। অগত্যা আরও কিছুক্ষণ পাঠ করে মা ছেলের আব্দার রক্ষা করেন। ছেলে খুশী হয়। মাও কম খুশী হন না।

কে এই অসাধারণ ছেলে রামায়ণের প্রতি যাঁর এমন অগাধ অনুরাগ? ইনিই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বঙ্গভারতীর বরপুত্র। ইনিই সর্বপ্রথম বাংলা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেন। বাল্যে বহু-শ্রুত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে পরিণত বয়সে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁর অমর সৃষ্টি।

যশোহর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশে) কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রাম। ঐ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মধুসূদনের জন্ম হয় ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন বিদ্বান্ ও কৃতী পুরুষ। মাতা জাহ্নবী দেবী ছিলেন নানাগুণে গুণবতী রমণী।

বাল্যে নিজ গ্রাম সাগরদাঁড়িতেই মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। প্রথমে বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে হয় হাতেখড়ি। তারপর গ্রামের পাঠশালায় যান। সেখানে গুরুমশায়ের কাছে তিনি বাংলা ও গণিত শেখেন। গ্রামের অনতিদূরে সেখপাড়ায় এক মৌলবীর কাছে তিনি পারশী কবিতা শিখতে

যেতেন। মৌলবী সাহেব মধুসূদনকে অল্প বয়সেই অনেক পারশী কবিতা মুখস্থ করিয়েছিলেন। জননী জাহ্নবীর বাংলা সাহিত্যে বেশ অনুরাগ ও দখল ছিল। তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহে ছিল রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ। তিনি তাঁর ছেলেকে ঐসব বই ও অন্যান্য প্রাচীন কাব্য পাঠ করাতেন। যে সব পৌরাণিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মধুসূদন পরবর্তী জীবনে আত্মহারা হতেন, তার বীজ অতি শৈশবেই জননীর সাহায্যে তাঁর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিশোর মধুসূদন অনেক সময় কপোতাক্ষতীরে বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করতেন।

পাঠশালায় মধুসূদন সকলের সেরা ছাত্র ছিলেন। তাঁর বিদ্যানুরাগ অত্যন্ত গভীর ছিল। সকালে পাঠশালা ছুটি হলে অন্যান্য ছেলেদের মতো মধুসূদনও খাবারের জন্য বাড়ি আসতেন। খেতে একটু দেরি হলে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। তাঁর সমবয়সী বাড়ির অপর ছেলেরা খাবার সময় যখন নানা বায়না করে, তখন মধুসূদন কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে এবং এক-একদিন বা অসিদ্ধ তরকারি দিয়ে খেয়ে সকলের আগে গিয়ে পাঠশালায় বসতেন। পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে কি করে তিনি সকলের সেরা ছাত্র হবেন, এই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয়। লেখাপড়ায় কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যাবে, এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। এই উচ্চাভিলাষ তাঁর চরিত্রে আজীবন দেখা যেত।

মধুসূদনের দশ-এগার বছর বয়সে রাজনারায়ণ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন ভাল ইংরেজি শেখাবার জন্য। প্রথমে অল্পদিন খিদিরপুরের ইংরেজি স্কুলে পড়ার পর মধুসূদন কলকাতার বিখ্যাত হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। বাল্যের গভীর বিদ্যানুরাগ হিন্দু কলেজে আরও গভীরতর হল। এখানে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্র বলে পরিচিত হলেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রায়ই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করতেন। এবং এক-একসময় দু-তিন শ্রেণী ও অনেক কৃতী ছাত্রকে অতিক্রম করে বৃত্তিলাভ করতেন। মধুসূদন সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে একবার এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। তাঁর এক সহাধ্যায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তাঁর গুণকীর্তন না করে থাকতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, "বয়সে মধু আমাপেক্ষা ছোট ছিল; কিন্তু

এমনই তাহার বিদ্যাবুদ্ধির জোর যে আমাদিগের অনেক পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া লম্ফে-লম্ফে নিম্নশ্রেণীসকল অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প-সময়ের মধ্যেই সে আমাদিগের সহাধ্যায়ী হইয়াছিল।” হিন্দু কলেজে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে তাঁর সহপাঠীদের সকলেই একবাক্যে লিখেছেন, “কলেজে উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের মধ্যে মধুসূদন ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন।”

ইংরেজিতে মধুসূদনের রীতিমতো অধিকার জন্মেছিল। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। ভাল ইংরেজি শেখবার জন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। বেশভূষা, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা সবই তিনি ইংরেজি কায়দায় করতেন। এমনকি যাকে বলে ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখা তাও বোধ হয় তিনি করতেন। ছাত্রজীবনে, বিশেষতঃ সিনিয়র বিভাগে পড়বার সময় তিনি বহু ইংরেজি কবিতা রচনা করেছিলেন। সে-সবের অনেকগুলি এ দেশের ও বিলেতের একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ডি.এল. রিচার্ডসন সাহেব মধুসূদনের রচনা-নৈপুণ্যে বিমোহিত হয়ে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করতেন। কেউ-কেউ তাঁকে বিখ্যাত ইংরেজ কবি আলেকজাণ্ডার পোপের সঙ্গে তুলনা করে ‘পোপ’ সম্বোধন করতেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ারও মধুসূদনের প্রখর বুদ্ধি ও রচনা শক্তি দেখে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে বহু বই পড়ে শেষ করেছিলেন। কলেজে ‘বহুপাঠী ছাত্র’ বলেই তাঁর খ্যাতি ছিল।

সাহিত্যবিদ্ মধুসূদনের গণিতশাস্ত্রেও অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু গণিতের চর্চা তিনি বড় একটা ভালবাসতেন না। একবার ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সহপাঠীদের সঙ্গে সেক্সপীয়র ও নিউটনের মধ্যে প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মধুসূদন সেক্সপীয়রের পক্ষ অবলম্বন করে বলেছিলেন, “সেক্সপীয়র চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারতেন; কিন্তু নিউটন চেষ্টা করলে কখনো সেক্সপীয়র হতে পারতেন না।” হঠাৎ একদিন তিনি এই কথা সকলের সামনে প্রমাণ করে দিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিলেন। অধ্যাপক রীজ একদিন ক্লাসে গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন সমাধান করতে দিলেন। কোন ছাত্রই যখন তা সমাধান করতে পারল না, তখন

মধুসূদন খড়ি হাতে নিয়ে বোর্ডে গিয়ে সমাধান করলেন এবং পূর্বোক্ত প্রতিপক্ষীয় সহপাঠীদের কটাক্ষ করে সদম্ভে বললেন, "সুতরাং চেষ্টা করলে সেক্সপীয়র নিউটন হতে পারেন।" উঠবার সময় যাঁরা তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নানা রহস্য-কৌতুক করেছিলেন, গণিতে তাঁর অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখে নীরবে মুখ নীচু করে রইলেন। মধুসূদন তখন বললেন, "কিন্তু আমার গণিত-শেখা এই পর্যন্তই শেষ।" গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজ-নারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

মধুসূদনের ব্যঙ্গ করার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল এবং গীতিবাদ্যেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে পারস্য ভাষায় রচিত গজল গান গেয়ে বন্ধুদের আনন্দ দিতেন।

বিলেত যাওয়ার প্রলোভনে মধুসূদন হঠাৎ একদিন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। হিন্দু কলেজে তাঁর আর স্থান হল না। তখন তিনি শিবপুরে বিশপ্‌স্‌ কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে লাটিন, হিব্রু, পারশী, আরবী এবং সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। এই কলেজে অধ্যয়নের ফলেই মধুসূদন একজন বহু ভাষাবিদ্‌ হতে পেরেছিলেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি বিশপ্‌স্‌ কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে পরিগণিত হলেন। বিশপ্‌স্‌ কলেজের লাইব্রেরিতে মধুসূদন রাশি-রাশি দুর্লভ গ্রন্থ পাঠ করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। হিন্দু কলেজ ছিল যেমন তাঁর কবিতা শিক্ষার কেন্দ্র, বিশপ্‌স্‌ কলেজ তেমন তাঁর ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র।

মধুসূদন যে কি বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বাংলার আদর্শ শিক্ষাগুরু মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক কথায় বলেছিলেন, "কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখনও দেখি নাই। মধুর বুদ্ধি বিদ্যুতের ন্যায় যেন চারিদিকেই খেলিত; আমার সেরূপ কিছু ছিল না।...মধুর বুদ্ধি বিশদ মণির ন্যায় ছিল, প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইত।"

মধুসূদনের জ্ঞানার্জন-স্পৃহা তাঁর জ্ঞানোন্মেষের সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমানভাবে বলবতী ছিল। বিদ্যার্জনে তিনি ছিলেন অক্লান্তকর্মী।

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।"

এক শিবরাত্রির সন্ধ্যা। অপূর্ব সুন্দর এক বালক শিব পূজায় মগ্ন। এমন সময় তাঁর এক প্রিয়সখা সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। গ্রামে আয়োজিত শিবলীলা বিষয়ক এক যাত্রায় তাঁকে শিব সাজতে হবে। আসলে যার শিবের ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই ব্যবস্থা। অবশ্য বালক খুব ভাল অভিনয় করতেও পারতেন। বালকের মাথায় জটা, কানে ধুতুরার ফুল, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে এবং সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখিয়ে আসরে নামানো হল। বালক তো তখন শিবভাবে একেবারে বিভোর। স্তব্ধ বিস্ময়ে সমস্ত সভাজন দেখতে লাগল তাদের চোখের সামনে যেন ধ্যানমগ্ন যোগীরাজ স্বয়ং সমুপস্থিত। ভাবাবিষ্ট বালক পাষাণমূর্তির ন্যায় স্থির হয়ে আসরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দুচোখ বেয়ে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। বালক সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। বহুক্ষণ ধরে বহু চেষ্টা করেও যখন বালকের সংজ্ঞা ফিরে এল না, তখন যাত্রার আসর ভেঙে দিতে হল। সমাধিস্থ অবস্থায়ই বালককে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল। সারারাত্রি এইভাবে কাটার পর ভোর বেলায় তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। পাঠশালার ছাত্রাবস্থায় বালকের প্রায়ই এরূপ ভাব-সমাধি হত।

কৌতূহল হয় অদ্ভুত স্বভাবের এই বালকের বিষয় জানতে।

ইনিই তো সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক, সকলের প্রাণের ঠাকুর, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ভব-

তারিণী মন্দিরের পূজক ছিলেন ইনি। সেইখানেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় তাঁর। জীবের কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্য। গল্পচ্ছলে অতি সহজ সরল ভাষায় তিনি ধর্মকথা বলতেন। তিনিই বলেছিলেন—"যত মত তত পথ"। বিশ্বজয়ী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মন্ত্র-শিষ্য।

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। তাঁর বাল্য নাম ছিল গদাধর। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ। মাতা চন্দ্রামণি দেবী ছিলেন অতি দয়াময়ী, ধর্মপ্রাণা, অতিথিপরায়ণা রমণী।

শিশু গদাধরের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় তাঁর পিতার কাছে। তারপর পাঁচ বছরে পড়লে, লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের যে পাঠশালা বসত সেখানে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। অল্পদিনের মধ্যেই গুরুমশাই ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার বুঝলেন, গদাধর সাধারণ পড়ুয়ার মতো নন—তিনি রীতিমতো শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর। যা একবার পড়েন বা শোনেন তাই-ই চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে যায় তাঁর মনে। তাঁর হাতের লেখা ছিল সুন্দর—একেবারে মুক্তোর মতো। পাটিগণিত কিন্তু তাঁর একটুও ভাল লাগত না। কিছু দিনের মধ্যেই গদাধর বেশ লিখতে পড়তে সক্ষম হলেন। রামায়ণ এবং মহাভারত বালক খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। আর ভক্তদের কাহিনী পড়তে পড়তে তাতে একেবারে যেন ডুবে যেতেন। গদাধর গান গাইতে ও অভিনয় করতে পারতেন খুব ভাল। তাঁর মধুর কণ্ঠের শ্যামাসঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত ও পদাবলী কীর্তন লোককে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় করে রাখত। ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়ায় গদাধরের অসামান্য দক্ষতা ছিল।

বাল্যে অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন গদাধর। যেখানে বয়স্করাও একা যেতে সাহস পেত না, গদাধর সেখানে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সাধু-সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ মিললে বালক বিভোর হয়ে পড়ে থাকতেন তাঁদের কাছে। কোন কোন দিন পরবার কাপড়খানিকে কৌপীনের মতো করে পরে ঘরে ফিরতেন। কোনও দিন বা সর্বাঙ্গে বিভূতি মেখে আসতেন। মা চন্দ্রামণি জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'সাধু হয়েছি যে মা'—বলে হেসে গড়িয়ে পড়তেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব ঘন ঘন গদাধরের ভাব-সমাধি হতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলে বলতেন, কোনও দেবদেবীর ধ্যান করতে বসলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ধ্যানের দেবতাকে তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে পান। এদিকে পাঠশালার লেখাপড়ার প্রতি বালকের বিতৃষ্ণা বাড়তে লাগল। শেষে পাঠশালায় যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

কলকাতার ঝামাপুকুরে বড় ভাই রামকুমার একটি টোল খুলেছিলেন। একবার বাড়ি গিয়ে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, নিজের কাছে রেখে পড়াশোনা করাবেন বলে। কিন্তু গদাধরের সেই একই অবস্থা। পড়াশোনার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ নেই। রামকুমার একদিন ভাইকে বললেন—একেবারেই কি পড়াশোনা করবি না, আদ্য-মধ্যটা অন্ততঃ পাস দে।

গদাধর বললেন—দাদা, বলেছি তো, তোমাদের ঐ চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যেয় আমার কাজ নেই। আমি চাই আসল জ্ঞান, যাতে হয় মানুষের মুক্তি।

১৮৫৬ সালে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে গড়লেন এক মন্দির। প্রতিষ্ঠিত হল ভবতারিণী মাতৃমূর্তি। মন্দিরের পূজারী হয়ে এলেন রামকুমার। সঙ্গে এলেন গদাধর। গদাধর দেবী পূজায় দাদা রামকুমারকে সাহায্য করেন। বাকী সময় আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়ান গঙ্গাতীরে। কখনো গান গেয়ে, কখনো বা মা-মা ডাকে সমস্ত প্রান্তর মুখর করে। কখনো আপন মনে মাটি দিয়ে শিবমূর্তি গড়েন।

রামকুমারের মৃত্যুর পর ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হলেন গদাধর। বালক পূজারীর ব্যাকুলতাভরা মা, মা ডাকে মন্দির হল মুখরিত, জীবন্ত। কিছুদিন পরে তোতাপুরী নামে এক সন্ন্যাসী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর নিকট জ্ঞানের সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করলেন গদাধর। পরিচিত হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে। সাধনাবলে মানবজীবনের একান্ত কাম্য এমন এক পরম জ্ঞান পরমহংস লাভ করেছিলেন, বিশ্বে যার কোন তুলনা নেই। তাই তিনি আজ বিশ্ববন্দিত মহামানব।

# ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
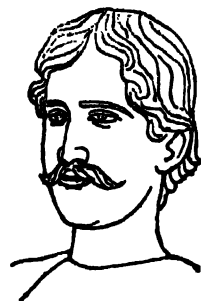
"দেশকে মাতৃরূপে বন্দনার মহান মন্ত্র তিনিই আমাদের দিয়েছেন।"

বালকের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হল। লেখাপড়া শেখাবার জন্য পাঠশালায় পাঠাবার আগে প্রচলিত প্রথা অনুসারে বাড়িতে হাতেখড়ি অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠান-শেষে কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ঠাকুর বালকের হাতে প্রথম হাতেখড়ি দিলেন। তারপর বালককে নিয়ে যাওয়া হল গ্রামের পাঠশালায়। সেখানে রামপ্রাণ সরকার গুরুমশাই বালকের হাতেখড়ি ধরিয়ে দিয়ে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি অক্ষরগুলি একবার করে লিখে দিতে লাগলেন। বালক এক একটি অক্ষর শিখে ফেলতে লাগলেন। দ্বিতীয়বার আর দেখাতে হল না। এইভাবে একদিনেই তিনি সব অক্ষর সহজে শিখে ফেলেছিলেন। এতো তাড়াতাড়ি সমস্ত অক্ষর শিখে ফেলায় গুরুমশাই একদিন বলেছিলেন, "বাপু, এরকম করে যদি শিখে ফেলো, তাহলে ক'দিন আমি তোমায় পড়াতে পারবো।"

কে এই অসাধারণ বালক যাঁর প্রতিভায় গুরুমশাই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়েছিলেন।

ইনিই "বন্দেমাতরম্" জাতীয় মন্ত্রের উদ্গাতা সাহিত্য-সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে এঁর অবদান অসামান্য।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুন বা বাংলা ১২৪৫ সালের ১৩ আষাঢ় মঙ্গলবার চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় সাত-আট বছর বয়সে। তাঁর পিতা যাদরচন্দ্র তখন মেদিনীপুরে ডেপুটি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুরের উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি তাঁর অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিতে থাকেন। অতি দ্রুত তাঁকে শিক্ষার বিষয় আয়ত্ত

করতে দেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অবাক হয়ে যেতেন। কোনো পড়ার বিষয় একবার শুনে বা দু-একবার পড়েই তিনি সহজে আয়ত্ত করে ফেলতেন। শিক্ষকরা তাঁকে শ্রুতিধররূপেই মনে করতেন। কয়েক বার বালক বঙ্কিম বছরে দু-বার করে প্রমোশন পেয়েছিলেন। পুরো এক বছর এক শ্রেণীতে থাকতে হয়নি। তবুও ক্লাসে প্রথম হতেন।

যাদবচন্দ্রকে বদলী করায় বঙ্কিমচন্দ্রকেও মেদিনীপুর ত্যাগ করতে হল। কিছুদিন তিনি হুগলী কলেজের (তখনকার নাম 'হাজি মহম্মদ মহসীন কলেজ') স্কুল বিভাগে ভর্তি হলেন। জুনিয়ার বৃত্তি-পরীক্ষায় তিনি সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে প্রথম হন। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়ও বঙ্কিম প্রথম স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করেন। সকল বিষয়েই তিনি সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ক্লাসের পড়া করতেন কম। বাইরের বই বেশী পড়তেন। অনেক সময় ক্লাস থেকে পালিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে এক কোনে বসে নানা ধরনের বই পড়তেন। ফলে স্কুল ও কলেজ জীবনে তিনি অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় গদ্য ও পদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বার হত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর রচনার খুব প্রশংসা করতেন। বলতে গেলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গুরু। একবার 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে বঙ্কিমচন্দ্র কুড়ি টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঐ কবিতার নাম ছিল 'কামিনীর প্রতি উক্তি'। ছাত্রজীবনেই তিনি 'ললিতা ও মানস' নামক একটি কবিতা পুস্তকও রচনা করেছিলেন। গলী কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজি লেখায় ও পড়ায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় সংস্কৃতের এক পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করে সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। গণিতশাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। একদিন গণিতের এক শিক্ষক তাঁকে জ্যামিতির একটি প্রতিজ্ঞা বোর্ডে বুঝিয়ে দেন। সেই প্রতিজ্ঞাটি বঙ্কিম যখন বোঝাতে উঠলেন, তখন তিনি ৭০টি প্রতিজ্ঞার অবতারণা করেছিলেন। বালক বঙ্কিমের এই অসাধারণ প্রতিভা দেখে অধ্যাপকমশাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় পাস করার পর আইন পড়বার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র

হুগলী কলেজ ত্যাগ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ঐ সময় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ঐ বছরই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়। বঙ্কিম পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বি. এ. পরীক্ষা গ্রহণ শুরু করে। ঐ পরীক্ষা বেশ শক্ত ছিল। অনেক শক্ত শক্ত বই পড়ে পরীক্ষা দিতে হত। বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষার মাত্র দু-তিনমাস পূর্বে স্থির করলেন যে তিনি ঐ বছরই বি. এ. পরীক্ষা দেবেন। এ কথা শুনে ছাত্র ও শিক্ষক মহলে অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল। সাধারণ বিভাগে কিছুমাত্র না পড়ে, কোনো অধ্যাপকের কাছে ক্লাস না করে যে কোন ছাত্র বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হতে পারে এটা অধ্যাপকদেরও কল্পনাতীত। কয়েকজন অধ্যাপক তাঁকে নিষেধও করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঐবারে মোট পরীক্ষার্থী ছিল তেরজন। তার মধ্যে দশজন পরীক্ষা দিয়েছিল। ফল বার হলে সকলে সবিস্ময়ে দেখল যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আর একজন মাত্র পাস করেছিলেন— তাঁর নাম যদুনাথ বসু। পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ফল দেখে চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের বি. এ. পরীক্ষা দেওয়াকে বাতুলতা বলে ভেবেছিলেন তাঁরাই এখন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার অজস্র প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁর এই কৃতিত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন ) এবং বহু ইংরেজ সাহেব বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তৎকালীন বাংলা সরকারের সেক্রেটারী ইয়ং সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেকে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন যে তিনি ঐ চাকরি গ্রহণ করলে ছোটলাট সাহেব খুব খুশী হবেন। বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সম্মতি নিয়ে ঐ চাকরি গ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্রজীবনে শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে একাগ্রতার মাধ্যমে বিদ্যার্জন দ্বারা নিজেকে গড়ে তুলতে পারলে জীবনে যে অভাবনীয় সুযোগ আসে, বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

# বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

"তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মের সাথে মানব মর্মের আত্মীয়তা।"

একদিন সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের একদল ছাত্র শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন্স দেখতে গেল। সঙ্গে ছিলেন কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লেফণ্ট। বাগানের চারদিক ঘুরে বেড়াবার সময় একটি কৌতূহলী ছাত্র তাঁকে গাছপালা সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তুললেন। যেমন—গাছপালা বড় হয় কেন? মানুষের স্পর্শ পেলে লজ্জাবতী লতা কেন সংকুচিত হয়, সূর্যমুখী ফুল উপরের দিকে কেন মুখ করে ফোটে? বাতাসে গাছের পাতার যে মর্মর শব্দ হয়, সে কি শুধু শব্দ না গাছের ভাষা। ছাত্রটির প্রশ্নের ধরন দেখে ইংরেজ অধ্যাপক বিস্মিত হন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, "বালক, তুমি একজন বড় বৈজ্ঞানিক হবে" (মাই সন্. ইউ উইল বি এ গ্রেট ম্যান অব্ সায়েন্স)।

দূরদর্শী ইংরেজ অধ্যাপকের সেই ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হয়নি। ছাত্রটি পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। বিশ্বের বিজ্ঞান সভায় তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে গাছপালা, এমন কি কাঠ, পাথর প্রভৃতি জড়পদার্থেরও প্রাণ আছে। জীবের মতো উদ্ভিদও আঘাত পেলে সাড়া দেয়। প্রাণীর মতো উদ্ভিদেরও স্নায়ু, পেশী ও হৃদ্‌যন্ত্র আছে। মানুষ ও জীবজন্তুর মতো বৃক্ষাদিও জাগে, ঘুময়। জীবজগতের সঙ্গে উদ্ভিদ জগতের আত্মীয়তা আছে। ইনিই প্রথম রেডিও বা বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ইনিই বাংলা তথা ভারতের গৌরব বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার-হৃদয়, কর্তব্যনিষ্ঠ ও স্বদেশ-প্রেমিক। দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রের মা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীলা, নিষ্ঠাবতী ও উদার-হৃদয়া রমণী।

গ্রামের একটি সাধারণ বাংলা স্কুলে জগদীশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন। স্কুলে তাঁর সঙ্গীদের কাছে নানারকম পশু পাখী ও জীবজন্তুর বিচিত্র জীবনের কথা তন্ময় হয়ে শুনতেন। গ্রামের নানাপ্রকার পশু পাখী ও গাছপালার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ। স্কুলে পড়ার সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই গ্রন্থদ্বয় তিনি নিয়মিত পাঠ করে বিশেষ আনন্দ পেতেন। তিনি বলতেন, "এই মহাকাব্যদ্বয় ভারতের মহারত্ন। বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।"

বাংলা স্কুলে পড়া শেষ হলে ন-বছর বয়সে জগদীশচন্দ্রকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করা হয়। তিন মাস পরে তাঁকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করানো হয় ভাল ইংরেজি শেখাবার জন্য। লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। আর তাঁর ব্যবহার ছিল বিনম্র। তাই অল্প দিনের মধ্যে তিনি শিক্ষকদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

ছাত্রজীবনে জগদীশচন্দ্র খুব নিয়মানুবর্তী ছিলেন। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সব কাজ রুটিন বেঁধে করতেন। খুব ভোরে উঠে ব্যায়াম করতেন। তারপর ক্লাসের পড়া পড়তেন। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে কিছু সময় খেলাধূলা করে সন্ধ্যা হলেই আবার পড়তে বসতেন। ছাত্রজীবনে তাঁর চালচলন ও বেশভূষা ছিল একেবারে সাদাসিদে। দেহ ছিল যথেষ্ট বলিষ্ঠ।

ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। সেখানে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লেফণ্টের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ফাদার লেফণ্টের শিক্ষাদানের ফলে বিজ্ঞানের প্রতি জগদীশচন্দ্রের গভীর অনুরাগ জন্মে। বিশ বছর বয়সে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি বি. এ. পাস করেন। তারপর বিলেত যাত্রা করলেন উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। সেখানে প্রথমে ডাক্তারী ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু ভাল না লাগায় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়

কেম্‌ব্রিজে বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হলেন। এখানে বিজ্ঞানে বহু নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় তাঁদের সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর পড়ার বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। চার বছর কঠোর পরিশ্রম ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করার পর জগদীশচন্দ্র কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপোজ' উপাধি লাভ করেন। তিনটি বিষয়ে উপাধি পাওয়াকেই 'ট্রাইপোজ' বলে। এই উপাধি পাওয়া অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে জগদীশচন্দ্র সেখানকার বি. এস-সি উপাধিও লাভ করেছিলেন। এইখানেই তাঁর প্রতিভাদীপ্ত গৌরবময় ছাত্রজীবনের সমাপ্তি।

# বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক।"

কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর বাড়ির ছোট্ট একটি ছেলে। স্কুলে যাবার বয়স হয়নি তখনো। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েন। একদিন দাদাদের স্কুলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে দেখে বায়না ধরলেন, তিনিও স্কুলে যাবেন। সবাই মিলে অনেক বোঝালেন। তিনি কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। শেষে কান্না জুড়ে দিলেন, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন। তখন গুরুমশাই গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন ইস্কুল যাবার জন্য যেমন কাঁদছ, একদিন না যাবার জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী কাঁদতে হবে।" ছেলেটির জীবনে গুরুবাক্য সত্যি সত্যিই ফলে গিয়েছিল। কিছুদিন তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্কুল-জীবন তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। শেষে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। বাড়িতেই স্বাধীনভাবে পড়াশোনা ও কাব্য-চর্চা করে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। বাল্যের স্কুল-পালানো এই ছেলেটি পরিণত বয়সে হয়েছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি, চিন্তাবিদ্ ও মানবপ্রেমিক।

ইনিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করে বাংলা তথা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এঁরই জন্য বাংলা-সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। 'কবিগুরু' বা 'গুরুদেব' রূপে ইনি সকলের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ, ৮ মে) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি

ছিলেন খুব জ্ঞানী ও ধার্মিক এবং ঋষির ন্যায় জীবনযাপন করতেন। রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী ছিলেন অত্যন্ত সরলমনা রমণী। রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে দীপমালা জ্বেলে প্রার্থনা করেছিলেন—'রবির প্রভায় যেন বিশ্ব আলোকিত হয়।'

বাল্যে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দিয়ে বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ হয়। কর, খল ইত্যাদি বানান শেষ করে বালক একদিন পড়লেন—'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। এই চারটি শব্দের মিলনে যে সুর ও ছন্দ আছে তা প্রথম ধরা পড়ল শিশু-রবির কানে। ছন্দের দোলায় এক অপূর্ব আনন্দে তাঁর প্রাণমন ভরে উঠল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজ যখন মনে পড়ে তখন বুঝতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন।"

শিশু রবিকে প্রথমে চিৎপুর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে নর্মাল স্কুলে ভর্তি করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সাত-আট বছর বয়সেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। এতে তাঁর দাদারা তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিতেন। এদিকে বালক রবি কবিতা লেখেন একথা অনেকেই জেনে গিয়েছিল। নর্মাল স্কুলের শিক্ষকরাও জেনেছিলেন। ঐ স্কুলের সাতকড়ি দত্ত নামে এক শিক্ষক বালক কবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দেবার জন্য মাঝে মাঝে দু-এক পদ কবিতা লিখে দিয়ে তা পূরণ করে আনতে বলতেন। একদিন নিচের দুটি পদ দিয়ে তা পূরণ করে আনতে বললেন,—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে রচনা করলেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ঐ সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের অপর একটি কবিতা বড় সুন্দর—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিকে নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

এই রকম আরও অনেক কবিতা তিনি ঐ সময় রচনা করেন। ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নিচে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথকে নর্মাল স্কুল থেকে বেঙ্গল একাডেমি নামে এক ফিরিঙ্গী স্কুলে ভর্তি করা হয়। এ স্কুলও রবীন্দ্রনাথের মোটেই ভাল লাগল না। তখন তাঁকে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি করা হল। এখানেও ফল একই হল। কোনো স্কুলের পরিবেশই তাঁর পছন্দ নয়। অবশেষে তিনি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলেন। তাঁর এই আচরণে বাড়ির সবাই হতাশ হলেন। তিনি যে মানুষ হবেন এমন আশা কারুর রইল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড় দিদি কহিলেন—আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড় হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।"

রবীন্দ্রনাথ স্কুল ছাড়লেও পড়াশোনা ছাড়েননি। বাড়িতে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন। তাঁর অনেক কিছু জানবার ভীষণ কৌতূহল ছিল। এ জন্য গভীর রাত পর্যন্ত জেগে পড়তেন। মাঝে মাঝে তাঁর বড় দিদি বাতি নিভিয়ে দিয়ে তাঁকে বিছানায় পাঠিয়ে দিতেন।

বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের পড়ার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল। এক এক বিষয় পড়াবার জন্য এক একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। খুব ভোরে উঠে ব্যায়াম করতেন। তারপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রুটিন ধরে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও সংস্কৃত প্রভৃতি পড়তেন। সংগীত-গুরু বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী ও যদু ভট্টের নিকট তিনি গান শিখতেন। মাঝে মাঝে পিতার সঙ্গে হিমালয়ে বেড়াতে যেতেন। তখন মহর্ষি নিজেই তাঁকে পড়াতেন। সতের বছর বয়সে তাঁকে বিলেত পাঠানো হয়েছিল ব্যারিস্টারি পড়াবার জন্য। সেখানে ব্রাইটন পাবলিক স্কুলে তিনি ভর্তিও হয়েছিলেন। এই স্কুলও তাঁর ভাল লাগল না। কিছুদিন পরে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে সাহিত্য-পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠছিলেন। তাঁর দাদারা ও দিদি সাহিত্যচর্চা করতেন। কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী সাহিত্যিক তাঁদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন। কবি

বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে আসতেন এবং তাঁর রচিত নতুন নতুন কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগত। বিহারীলালই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। গান রচনায় তাঁর জ্যোতিদাদা তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজিয়ে নিত্য নতুন নতুন সুর তৈরী করতেন। আর রবীন্দ্রনাথ কথা দিয়ে সেই সুরগুলিকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করতেন।

কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখা বার হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে এক পত্রিকায়। তারপর তাঁদের বাড়ি থেকে 'ভারতী' নামে একখানি পত্রিকা বার হলে, তাঁর লেখা ঐ পত্রিকায় খুব ঘন ঘন প্রকাশিত হতে থাকে। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল বছর। তিনি নামে-বেনামে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা বিষয়ে রচনা আরম্ভ করলেন। সাহিত্যিক মহলে তাঁর লেখার সমালোচনাও হতে লাগল। কিশোর বয়সেই তাঁর লেখা 'কবি কাহিনী', 'বনফুল', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'ভগ্নহৃদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। দিন রাত পড়ছেন আর লিখছেন। কোনো বিদ্যালয়ে না পড়লেও তাঁর বাড়ি এবং সারা বিশ্ব-প্রকৃতি ছিল তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়।

# আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

"আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপনা করেছেন
উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।"

"ছাত্রজীবনে আমার পড়াশুনার বেশ অভ্যাস ছিল. কিন্তু তাই বলিয়া আমি গ্রন্থ-কীট ছিলাম না। স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকে আমার জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটিত না। আমার বাইরের বই পড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল এবং যখন আমার বয়স মাত্র বারো বছর সেই সময় আমি শেষ রাত্রে ৩টা, ৪ টার সময় উঠিয়া কোনো প্রিয় গ্রন্থকারের বই নির্জনে বসিয়া পড়িতাম। এখন পর্যন্ত ইতিহাস ও জীবনচরিত আমার খুব প্রিয় জিনিস। জোন্সের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার মাতার সেই উক্তি—'পড়িলেই সব জানিতে পারিবে'—'আমি ভুলি নাই।"

ইনিই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ইনি দেশ-প্রেমিক এবং মানবপ্রেমিকও ছিলেন। বাংলার উন্নতির জন্য তাঁর জীবন কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২ আগস্ট খুলনা জেলার (বর্তমান বাংলাদেশে) রাড়ুলি গ্রামে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন সহজ-সরল, উদার-হৃদয় ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। হরিশচন্দ্রের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল, তাছাড়া তাঁর খুব ভাল একটি লাইব্রেরি ছিল। ছোটবেলা থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র পিতার ঐ লাইব্রেরির বইপত্র নাড়াচাড়া করতেন। সেই থেকে পড়ার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মে। প্রফুল্লচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী উন্নতমনা ও সরল-হৃদয়া রমণী ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র পিতা-মাতার সব সৎগুণই লাভ করেছিলেন।

পিতা হরিশচন্দ্র গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেইখানেই

প্রফুল্লচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। ন-বছর বয়সে তিনি মাইনর ( ষষ্ঠ শ্রেণী ) পাস করেন। তারপর কলকাতায় এসে বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। এখানে পড়তে পড়তে তের-চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর ভীষণ রক্ত-আমাশয় হয়। এতে শরীর এতো খারাপ হয় যে দু-বছর স্কুল বন্ধ করে তাঁকে বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। শরীর ভেঙে গেলেও তাঁর মনের বল অটুট ছিল। ঐ সময়টা বৃথা নষ্ট না করে বাইরের বহু বই মনের সাধে পড়েছিলেন। গোল্ডস্মিথের 'ভাইকার অব্ ওয়েকফিল্ড,' জনসনের 'রাসেলাস,' সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থগুলী তিনি পাঠ করেছিলেন।

দু-বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি তাঁর সহজ সরল ব্যবহার ও ভাল পড়াশোনার জন্য সকল শিক্ষকের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গেও তিনি মিশতেন না। অধ্যয়ন, ব্যায়াম ও কৃষি কাজ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। যখন গ্রামে থাকতেন, তখন মাটি কাটা ও বাগানের কাজ করতেন। সাঁতার কাটা ও নৌকা চালনা তাঁর খুব প্রিয় ব্যায়াম ছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যাসাগরমশাই-এর মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এখানে রসায়ন শাস্ত্র অবশ্য পাঠ্য ছিল। ইহা প্রফুল্লচন্দ্রের খুব ভাল লাগল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অনেকগু'ল রসায়ন শাস্ত্রের বই পড়ে ফেললেন। এ ছাড়া, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। এখন বিজ্ঞান আরও বেশী প্রিয় হল। বিজ্ঞান-চর্চার জন্য তিনি বাড়িতে একটি পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটারিও স্থাপন করলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বি. এ. পাস করার পর 'গিলক্রাইস্ট' বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং বিলেত যাওয়ার বৃত্তি লাভ করেন। একুশ বছর বয়সে তিনি বিলেতের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রিয় বিষয় রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন এবং কঠোর পরিশ্রম করে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এস-সি. পাস করেন। বি. এস-সি. পড়বার সময় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল

—'সিপাই বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা।' এই প্রবন্ধ লিখে প্রফুল্লচন্দ্র বিলেতে খুব নাম করেছিলেন।

বি. এস-সি. পাস করার পর রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে 'ডক্টর' ( ডি. এস-সি. ) উপাধি পান। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনি 'হোপ প্রাইজ' নামে একটী বৃত্তি লাভ করেছিলেন। এরপর প্রফুল্লচন্দ্রের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। প্রেসিডেণ্টের অনুপস্থিতিতে সভায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন। প্রতিভা ও অধ্যবসায় গুণে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

বিলেতে ছ-বছর অবস্থান করার পর প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর গৌরবময় ছাত্রজীবন শেষ হয়। স্কুল, কলেজের পড়াশুনা শেষ হলেও তিনি সারাজীবন ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়ন করতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, "আজো আমি জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া থাকি। আজীবন আমি ছাত্রভাবেই আছি। কখন যে আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন চলিয়া গিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারি নাই। আজ বার্ধক্যে পদার্পণ করিয়া আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী করিয়া দিন অতিবাহিত করি—দিন সার্থক হয়। পৃথিবীতে যত কিছু সৎ চিন্তা আর উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যতকিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয় তাহার সবই পুস্তকে নিহিত।"

# বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এখন থেকে একশো বছর আগের কথা। বিলেত থেকে মস্ত বড় একটা যুদ্ধ জাহাজ এসে কলকাতা বন্দরে ভিড়েছে। কলকাতার একদল ছেলের জাহাজখানা দেখার বড় আগ্রহ হল। কিন্তু জাহাজ দেখতে হলে বন্দরের বড় সাহেবের পাস দরকার। অথচ সেই পাস যোগাড় করার মতো সাহস কারুর নেই। শেষে এগারো বছরের ছোট্ট একটি ছেলের সাহস ও বুদ্ধির কথা তাদের সকলের মনে পড়ল। তখন তারা সবাই মিলে সেই ছেলেটিকে ধরল একখানা পাস সংগ্রহ করে আনার জন্যে। ছেলেটি একদিন একখানা দরখাস্ত লিখে নিয়ে বড় সাহেবের অফিসে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু ছোট্ট ছেলে দেখে দারোয়ান কিছুতেই তাকে বড় সাহেবের কাছে যেতে দিতে রাজী নয়। ছেলেটিও ছাড়বার পাত্র নয়। দারোয়ান একটু অন্যমনস্ক হলে বালক পেছনের একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে একেবারে বড় সাহেবের কামরায় গিয়ে হাজির হল। দরখাস্তখানি সাহেবের সামনে ধরতেই সাহেব সই করে দিলেন। জাহাজ দেখার অনুমতি মিলে গেল। নামবার সময় বালক সামনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। দারোয়ান তো তাকে দেখে অবাক। সে জিজ্ঞেস করল, "তুম ক্যায়সে উপরমে গিয়া থা" (তুমি কি করে উপরে গেলে)। বালক মুখ ভেংচে বলল, "হাম্ যাদু জানতা হ্যায়" (আমি যাদু জানি)।

এই বালকই পরবর্তী কালের বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। যাঁর বলিষ্ঠ সুন্দর মূর্তি দেখে আমরা মুগ্ধ হই, মনে প্রেরণালাভ করি। ইনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে শিকাগো শহরে যে বিশ্বধর্ম মহাসভা বসেছিল তাতে বক্তৃতা দিয়ে ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা যে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ

করেছিলেন। বিদেশে ইনি ভারতের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিলেন। ইনি মানুষের মধ্যে জাতি ও ধর্মের বিভেদ তুলে দেন। ভারতবাসীকে ইনি ত্যাগ, সেবা ও দেশপ্রেমের আদর্শে জাগিয়ে তোলেন।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ছিল পৌষ সংক্রান্তি। সেই দিন ভোরে কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীর তিন নম্বর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। তাঁর বাল্য নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম। জন্মের পরে তাঁর মা নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর। ডাক নাম ছিল 'বিলে'। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন নামকরা এ্যাটর্নি। প্রচুর আয় করতেন। খরচও করতেন প্রচুর। তিনি ছিলেন পরোপকারী, দয়ালু ও পণ্ডিত ব্যক্তি! পড়াশুনা করতে তিনি খুব ভাল-বাসতেন। বাড়িতে তাঁর একটি গ্রন্থাগারও ছিল। সেখানে নানা বই ছিল। নরেন্দ্রনাথ পিতার এই গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন।

জননী ভুবনেশ্বরী ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীলা, ধর্মপরায়ণা, দয়াবতী, তেজস্বিনী রমণী। শোনা যায়, তিনি শিবের আরাধনা করে শিবের ন্যায় পুত্র নরেন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাদাস দত্ত ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে বাড়িতে রেখে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এঁদের সকলের সব গুণ পান।

ছোটবেলা নরেন্দ্রনাথ মায়ের কোলে বসে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতে খুব ভালবাসতেন। তাঁদের বাড়িতে প্রায় প্রত্যহ বিকেলে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হত। নরেন্দ্রনাথ এক মনে ঐ পাঠ শুনতেন। শুনতে শুনতে রামায়ণ, মহাভারতের অনেক অংশ তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। রামভক্ত হনুমানের চরিত্র তাঁর খুব ভাল লাগত।

পাঁচ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়। কিন্তু পাঠশালার পরিবেশ ভাল ছিল না বলে বিশ্বনাথ দত্ত বাড়িতে শিক্ষক রেখে নরেনের পড়ার ব্যবস্থা করেন। চোখ রাঙিয়ে তাঁকে কিছু করাবার উপায় ছিল না। তবে মিষ্টি কথায় সহজে বশ হতেন। বালক এক অভিনব উপায়ে পড়া তৈরী করতেন। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। গুরুমশাই প্রত্যেক দিনের পাঠ পড়ে যেতেন। আর বালক চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ঐ পাঠ শুনতেন। এতেই তাঁর পড়া তৈরী হয়ে যেত।

বাল্যকাল থেকেই নরেন্দ্রনাথ পরের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতেও দ্বিধা করতেন না। স্কুলে পড়বার সময় একবার তিনি এক চড়কের মেলা দেখতে গিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। মেলা থেকে একটি মহাদেবের মূর্তি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সঙ্গী বালক অন্ধকারে ভুল করে ফুটপাত থেকে রাস্তার উপর গিয়ে পড়ল। আর পেছন থেকে দ্রুতগামী একটি ঘোড়ার গাড়ি প্রায় তার ঘাড়ে এসে পড়ল। বালকের বিপদ দেখে রাস্তার লোক চীৎকার করে উঠল। নরেন্দ্রনাথ দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে সঙ্গী বন্ধুকে টেনে নিয়ে এলেন। বন্ধুর জীবন রক্ষা পেল। লোকে তাঁর সাহসের অজস্র প্রশংসা করতে লাগল। জননী ভুবনেশ্বরী ঘটনাটি শুনে আনন্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে নরেনকে কোলে নিয়ে বললেন, "সব সময় এই রকম মানুষের মতো কাজ করবার চেষ্টা করিস বাবা।" তখন নরেনের বয়স ছিল মাত্র ছ-বছর।

বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে বিশ্বনাথ দত্ত নরেন্দ্রনাথকে বিদ্যাসাগরমশাই-এর মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি করে দেন। তখন তাঁর বয়স সাত বছর। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দেখে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক সবাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি সুবোধ বালকের মতো দিনরাত বই নিয়ে বসে থাকতেন না। শরীর গঠনের জন্য খুব খেলাধূলাও করতেন। কিন্তু যেটুকু সময় পড়তেন, একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন। তাঁর একাগ্রতা এমন গভীর ছিল যে কোন বিষয় দু-একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। কিছুদিন পরে তিনি ক্লাসের সেরা ছাত্র হয়ে উঠলেন। বাল্যকাল থেকেই নরেন্দ্রনাথ পড়ার ও খেলার সাথীদের দলপতি বা নেতা ছিলেন এবং তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। বন্ধুদের কেউ অসুস্থ হলে নিজেই তার সেবা শুশ্রূষা করতেন।

স্কুলে পড়লেও নরেন্দ্রনাথের আসল শিক্ষা হচ্ছিল পিতামাতার নিকট। বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী ছিলেন আদর্শ জনক-জননী। নরেন্দ্রনাথের জীবনে যেসব মহৎ গুণ দেখা যায়, তা পিতামাতারই শিক্ষাদানের ফল। বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের সঙ্গে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করতেন যাতে বালকের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা জন্মে এবং জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে। পুত্রও পিতার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হতেন। জননী ভুবনেশ্বরীও পুত্রকে নানা বিষয়

শিক্ষা দিতেন। নরেন্দ্রনাথ পিতামাতাকে দেবদেবীর ন্যায় ভক্তি করতেন। তিনি যখন বিবেকানন্দ হয়েছিলেন, তখন বলতেন, "আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি আমার মা ও বাবার নিকট ঋণী"। আরও বলতেন, "যে মা-বাবাকে সত্য সত্য পূজা করিতে না পারে সে কখনও বড় হইতে পারে না।"

অনেক সময় বিশ্বনাথ দত্ত নিজেই ছেলেকে পড়াতেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও নরেন্দ্রনাথ পিতার নিকট সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতিও পড়তেন অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি আসতেন বিশ্বনাথ দত্তের বাড়িতে। সাহিত্য, দর্শনাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হত। পিতার অনুমতি পেয়ে নরেন্দ্রনাথ ঐ সব আলোচনায় যোগ দিতেন। তাঁর যুক্তিতর্কপূর্ণ আলোচনায় প্রবীণরা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। পিতার এক সাহিত্যিক বন্ধু একদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলেন যে, বালক বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখকের পুস্তকই পড়েছেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "বালক, একদিন-না-একদিন তোমার নাম আমরা শুনিতে পাইব।"

ষোল বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এজন্য বিশ্বনাথ দত্ত তাঁকে একটি সোনার পকেট ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। পরের বছর তিনি জেনারেল এসেমব্লিস ইনষ্টিটিউশন বা বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন।

কলেজে ভর্তি হয়ে নরেন্দ্রনাথ পড়াশোনায় আরও বেশী মনোযোগী হন। এই সময় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অগাধ জ্ঞানার্জন করা। সাহিত্য, ন্যায় ও দর্শন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। ইংরেজি ভাষার অনুশীলনেও তিনি যথেষ্ট মন দেন। ঐ ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া, কথাবার্তা বলা ও প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতি খুব ভালভাবে শিক্ষা করে কলেজের সেরা ছাত্র হন। কলেজে তিনি ছাত্র, অধ্যাপক সবারই খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব-চরিত্র দেখে সবাই মুগ্ধ হত। তর্কে কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। স্কুলের ন্যায় কলেজেও সকলের সেরা ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষায় পাস করার চেয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করাই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে কলেজের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব বলেছিলেন, "নরেন দর্শনের

একটি চমৎকার ছাত্র; জার্মানী ও ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর ন্যায় এরূপ প্রতিভাশালী ছাত্র নেই।" স্কুল থেকেই নরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেওয়া বিশেষভাবে অভ্যাস করতেন। একবার স্কুলের এক শিক্ষকের বিদায় অভিনন্দন সভায় আধ ঘণ্টা ধরে সুন্দর ইংরাজিতে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী ও দেশপ্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার অজস্র প্রশংসা করেছিলেন। একবার বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে এঁর ন্যায় বক্তা জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। নিজে খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। সহপাঠীরা দলবেঁধে তাঁর গান শুনত। গান তাঁর কাছে বিলাসিতা ছিল না। মনকে সুন্দর ও পবিত্র রাখার জন্যই গানের চর্চা করতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁর গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। এছাড়া, তিনি ভাল বাজাতে পারতেন, অভিনয়ও করতেন।

বাল্যকাল থেকেই নরেন্দ্রনাথের ঈশ্বরের প্রতি খুব ভক্তি ছিল। তাঁর নিজের উপরও বিরাট বিশ্বাস ছিল। কোন কাজ করা অসম্ভব এ তিনি কখনো মনে করতেন না। তিনি নিজের মধ্যে সর্বদা একটা বিরাট শক্তি অনুভব করতেন। ছাত্রজীবন থেকেই জগতের কল্যাণ হয় এমন কিছু করার কথা ভাবতেন। তাঁর চরিত্র এত উন্নত ছিল যে অনেক অসৎ ছাত্র তাঁর সংসর্গে এসে সৎ হয়েছে। ছাত্রজীবনে তাঁর বেশভূষা ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে। বিলাসিতা তিনি পছন্দ করতেন না। কোন ছাত্রকে বিলাসী হতে দেখলে বকাবকি করতেন। বলতেন বিলাসী হলে জীবনে বড় হওয়া যায় না।

কলেজে পড়ার সময় ঈশ্বর-চিন্তা তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। ঈশ্বর আছে কি নেই জানবার জন্যে তাঁর মন অস্থির হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে তিনি খুশী হতে পারেননি। এমন কি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথায় প্রথম প্রথম বিশ্বাস হত না। পরে ঠাকুরের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায় এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকেন। বিশ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পাস করেন। এর কিছু-দিন পরেই তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মারা যান। এখানেই তাঁর ছাত্র-জীবনের সমাপ্তি।

## স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

"ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতা পুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক রবসন্ সাহেব একদিন গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী থেকে এক পৃষ্ঠা ক্লাসে পড়ে শোনালেন। তারপর ছাত্ররা লিখে একে একে তাঁকে দেখাতে লাগল। আর তিনি এক-এক-জনের লেখা সংশোধন করে দিতে লাগলেন। একটি ছাত্রের খাতা দেখে রবসন্ সাহেব খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। কারণ, ছেলেটির লেখা প্রায় হুবহু বই-এর সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। ছেলেটিকে জোর ধমক দিয়ে বললেন, বই দেখে লিখেছ কেন? ছেলেটি বললেন, না স্যার, আমি বই দেখে লিখিনি। সাহেব অধ্যাপক আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আবার মিথ্যা কথা? বই দেখে লেখনি তো বই-এর সঙ্গে তোমার লেখা সব মিলে যাচ্ছে কেন? ছাত্রটি কিছু বিস্মিত হলেন। তারপর বিনীতভাবে বললেন—স্যার আমার কাছে তো কোন বই নাই, আমি কি করে নকল করব? তবে আমি যা শুনি, আমার সব মনে থাকে। তাই বই-এর সঙ্গে মিলে যায়। সাহেবের সন্দেহ দূর হল না। তিনি আরও দু-একবার পরীক্ষা করলেন ছাত্রটিকে। তারপর যা দেখলেন তাতে বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'এমন আশ্চর্য স্মরণ-শক্তি আমি অল্পই দেখিয়াছি।'

এই শ্রুতিধর ছাত্রটি কে?

ইনিই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ইনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতনে পরিণত করেছিলেন। এ দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, উচ্চ শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের জন্য আশুতোষ কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন।

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জুন সোমবার আশুতোষ মধ্য কলকাতায় ( মলঙ্গা লেন ) জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের পৈতৃক বাড়ি ছিল হুগলী জেলার জিরেট গ্রামে। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন নামকরা ডাক্তার। গঙ্গাপ্রসাদ অত্যন্ত দয়ালু ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। গরীব লোকদের তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। এমন কি তাদের অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। আশুতোষের মা জগত্তারিণী দেবী ছিলেন অত্যন্ত গুণবতী রমণী। যেমন ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি ছিল অপূর্ব তেজস্বিতা। এই আদর্শ পিতামাতার গুণ আশুতোষের মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

পিতা গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষের বাল্যকালেই ভবানীপুরে বিরাট বাড়ি তৈরী করে সেখানেই বসবাস করেন। বাড়িতে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ পড়া শেষ করলে পাঁচ বছর বয়সে বালক আশুতোষকে ঐ পাড়ার 'চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে' ভর্তি করা হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় তিনি দু-বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যেই সাধারণ ছাত্রের ছ-বছরের পড়া শেষ করে ফেললেন। এরপর কিছুদিন তিনি গৃহশিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করেন। পরে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি হন। তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। ভালভাবে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জন্য গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। একদিন তিনি আশুতোষকে বললেন, "তুমি যতদিন ক্লাসে প্রথম থাকিতে পারিবে, প্রত্যেক দিন তোমাকে এক টাকা করিয়া দিব। দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে আট আনা পাইবে।" অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান ছাত্র আশুতোষ স্কুলের পড়াশুনায় এতদূর উন্নতি করলেন যে, সারা বছরের মধ্যে মাত্র দুদিন দ্বিতীয় হয়েছিলেন। আর বাকী সবদিনই প্রথম হন।

গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে বলতেন, "ভাল করে শেখা চাই।" আশুতোষ সবকিছুই খুব ভাল করে শিখতেন। কোন বিষয় যতক্ষণ না ভাল করে বুঝতে পারতেন, ছাড়তেন না। গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে তাঁর ছাত্র-জীবনেই বক্তৃতা দিতে শেখান। পড়ার ঘরের মধ্যে একটি টেবিলের সামনে একটি টুল রাখা হত। আশুতোষ ঐ টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতেন। গঙ্গাপ্রসাদ হতেন শ্রোতা। বাল্যে বক্তৃতা করার এই অভ্যাসের ফলে আশুতোষ একদিন দেশের নামকরা বক্তাও হতে পেরেছিলেন।

বাল্যাবস্থা থেকেই আশুতোষের পড়ার প্রতি ছিল অদ্ভুত অনুরাগ। খুব ভোরে উঠে আলো জ্বেলে পড়তেন। প্রথমে পড়তেন পুরনো পড়া, তারপর নতুন পড়া। ক্লাসের পড়া হয়ে গেলে পাঠ্য পুস্তকের কিছুদূর এগিয়ে থাকতেন। অবসর সময় বাইরের ভাল ভাল বই পড়তেন। গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি কোন হাল্কা বই কখনো পড়তেন না। যেসব বই পড়লে মন ভাল হয়, চিন্তাশক্তি বাড়ে, সেই সব বই-ই তিনি পড়তেন। স্কুলে পড়তে পড়তেই তিনি ইংরেজ কবি মিল্টনের বিখ্যাত কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' এবং বিদ্যাসাগরের 'সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী' মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। ইংরেজি তিনি খুব ভাল শিখেছিলেন। অঙ্কে তাঁর অপূর্ব দখল ছিল। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় এফ. এ. পরীক্ষার সব অঙ্ক শেষ করে ফেলেছিলেন। সারা দিন-রাত পড়েও তাঁর আশা মিটত না। রাশি রাশি গ্রন্থের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারলেই যেন তৃপ্তি পেতেন। ছাত্রজীবনে আশুতোষ কখনো কোন নোট বই পড়েননি। মূল পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার করে পড়তেন। ফলে পাঠ্যপুস্তকের বহু অংশ তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় আশুতোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পাস করেন। তারপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে ইংরেজ অধ্যাপকদের তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। ছাত্রজীবনে আশুতোষ খুব সাদাসিধে ছিলেন। গণিতের অধ্যাপক বুথ সাহেব তাঁকে "সরল মানুষ" (সিম্পল্ ম্যান) বলে ডাকতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিরাট লাইব্রেরি দেখে আশুতোষ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। ক্লাস হয়ে গেলে তাঁকে প্রায়ই লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করতে দেখা যেত। কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যখন পড়েন, তখন অঙ্ক-শাস্ত্রে এম. এ. ক্লাসের পাঠ প্রায় শেষ করে ফেলেছিলেন। ঐ সময় তিনি ফরাসী ও লাটিন ভাষাও শিখেছিলেন। বেশি রাত জেগে পড়াশোনা করার ফলে একবার আশুতোষের শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এক বছর তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। তবুও এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ. এ. পরীক্ষার ফল বেরোবার এক মাসের মধ্যেই আশুতোষ বি. এ. ক্লাশের পাঠ্য পুস্তকগুলি পড়ে শেষ করে ফেলেন।

ছাত্রজীবনের শুরুতেই তিনি অনেক ভাল ভাল বই কিনেছিলেন। বি. এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর প্রায় পনের হাজার টাকার বই সংগৃহীত হয়েছিল। তিনি ছিলেন গ্রন্থ-প্রেমিক। পরবর্তী জীবনে নিজের বাড়িতে বিরাট এক গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সমগ্র সংগ্রহের মূল্য ছিল পাঁচ লক্ষাধিক টাকা। এতো বড় গ্রন্থাগার ভারতবর্ষে আর কারুর ছিল না। বর্তমানে তাঁর সমস্ত গ্রন্থ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে।

বি. এ. পড়ার সময়ই তিনি বিলেতের কোন কোন বিখ্যাত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। প্রত্যেক বিষয়ে আশাতীত নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি বি. এ. পাস করেন। এক বছর পরে অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হন এবং স্বর্ণপদক পুরস্কার পান। এরপর আইন পড়েন। আইনের তিনটি পরীক্ষার প্রত্যেকটিতেই প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। আইনশাস্ত্রে তাঁর কৃতিত্ব দেখে বিশ্ববিদ্যালয় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। গণিতশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বিলেতের একাধিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে সভ্য করে নিয়েছিল। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষা দিয়ে তিনি দশ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করেন। আশুতোষের গৌরবময় ছাত্রজীবন প্রত্যেক ছাত্রের অনুকরণ করার মতো।

# ভারত-ভগিনী নিবেদিতা

"লোকমাতা তুমি বিবেক-দুহিতা,
সার্থক তব নাম নিবেদিতা।"

ইউরোপের ছোট্ট একটি দেশ আয়ার্ল্যাণ্ড। সেখান থেকে এক ধর্মযাজক একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। কিছুদিন পরে এখান থেকে দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর এক ধর্মযাজক বন্ধুর বাড়ি গেলেন মনোহর ভারতের গল্প করতে। বাড়িতে ঢুকতেই তাঁর নজরে পড়ল ছোট্ট ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে। মেয়েটিকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তার মধ্যে তিনি যেন ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল ছবি দেখতে পেলেন। তিনি মেয়েটিকে আশীর্বাদ করে বললেন, "ভারতবর্ষ থেকে একদিন তোমার আহ্বান আসবে।"

ধর্মযাজকের সেদিনের ভবিষ্যৎ বাণী আয়ার্ল্যাণ্ডের ঐ মেয়েটির জীবনে সত্য হয়েছিল। একদিন ভারতবর্ষ থেকে সত্যই আহ্বান গিয়েছিল। তখন তিনি জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ড ত্যাগ করে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষকেই আপন মাতৃভূমিরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। তারপর ভারতের কল্যাণ ও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে ভারতের মাটিতেই দেহত্যাগ করেছেন।

কে এই দূরদর্শিনী মহীয়সী মহিলা যিনি মহান্ ভারতের মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে তার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে জন্ম ও জীবন সার্থক করতে চেয়েছিলেন।

ইনিই ভারত-কন্যা ভগিনী নিবেদিতা, জন্মসূত্রে আয়ার্ল্যাণ্ড-দুহিতারূপে যাঁর পূর্ব নাম ছিল মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের টাইরন্ প্রদেশের অন্তর্গত ড্যানগ্যানন নামক একটি ছোট শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোব্‌ল ছিলেন উদার-হৃদয়, নিষ্ঠবান, আদর্শ ধর্মযাজক ও দেশপ্রেমিক।

মাতা মেরী ইসাবেল হ্যামিল্টন ছিলেন বহু সদ্‌গুণে বিভূষিতা রমণী। নিবেদিতার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় পরিবারই তাঁদের ন্যায়, নিষ্ঠা, মহানুভবতা ও মানবতা প্রভৃতি মহান্ গুণের জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডে বিখ্যাত ছিলেন। তাছাড়া, উভয় পরিবারের মধ্যে দেশপ্রীতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। ভারতের ন্যায় আয়ার্ল্যাণ্ডও তখন ইংলণ্ডের অধীনে পরাধীন ছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে উভয় পরিবারই বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রেই নিবেদিতা পিতৃ-মতৃকুলের সকল সদ্‌গুণ লাভ করেছিলেন।

পিতা রিচমণ্ডের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে এবং শীঘ্রই মারা যান। তখন নিবেদিতার বয়স ছিল দশ বছর। তারপর মায়ের সঙ্গে মাতামহ হ্যামিল্টনের বাড়িতে গেলেন।

মাতা ইসাবেলের কাছে নিবেদিতার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। মায়ের কোলে বসে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। তারপর তাঁকে হ্যালিফ্যাক্স কলেজে ভর্তি করা হয়। এখানে অতি দ্রুত তিনি সবকিছু আয়ত্ত করতে লাগলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যয়নে গভীর অনুরাগ দেখে শিক্ষয়িত্রীরা মুগ্ধ হলেন। নিবেদিতা শীঘ্রই তাঁদের সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন। তাঁর পড়াশোনা কেবল বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বাইরের বহু বই গভীর আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সাহিত্য ছাড়া সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার চর্চা করতেন। বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার উপর তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল দেখা যেত। এইভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রীজীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার প্রতি নিবেদিতার সুগভীর অনুরাগের কথা জানা যায়। কোন নতুন বিষয় দেখলেই তিনি তার খুঁটিনাটি সবকিছু ভাল করে জানতে চাইতেন এবং যতক্ষণ না, তা আয়ত্ত করতে পারতেন, ততক্ষণ ছাড়তেন না। গভীর একাগ্রতার সঙ্গে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতেন। ছাত্রীজীবনে নিবেদিতার লক্ষ্য ছিল—তিনি যা-কিছু শিখবেন তা বেশ ভাল করেই শিখবেন, তার মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক বা অস্পষ্টতা থাকবে না। এই নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার জন্য তিনি বহু বিষয়ে

অগাধ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন করতেন তা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অনুকরণযোগ্য।

ছাত্রীজীবনেই নিবেদিতার চরিত্রে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখা দিয়েছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর জ্ঞান ও উন্নত চিন্তাধারা তাঁকে সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছিল। তাই তিনি অতি সহজেই সহপাঠিনীদের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীন করার জন্য যে বিপ্লবী দল গঠিত হয়, ছাত্রীজীবনেই নিবেদিতা তার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। গোপন আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর এই ছাত্রীজীবনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রয়োগ করেছিলেন।

বাল্যাবস্থা থেকে তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল। সেই আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি মানব-সেবামূলক বড় কোন কাজ করবার কথা চিন্তা করতেন। সতের বছর বয়সে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হয়। তাঁদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না এবং শিক্ষার প্রতি সহজাত গভীর অনুরাগের জন্য তিনি শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিন পরে লণ্ডনে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর অভিনব ও উদার ধর্ম-ব্যাখ্যায় নিবেদিতা মুগ্ধ হন। যে-দেশের ধর্ম ও দর্শন এতো উদার ও মহান সেই ভারতবর্ষের প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান পেয়ে আর্ত ভারতবাসীর সেবার ভার নিয়ে ভারতে আসেন। স্বামীজী তাঁকে ত্যাগ ও সেবার ব্রতে দীক্ষা দিয়ে ভারতমাতার চরণে নিবেদন করেন—নাম দেন নিবেদিতা। সেই থেকে নিবেদিতা ভারত-দুহিতা, ভারতবাসীর ভগিনীস্বরূপা।

# মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

"আমার জীবনই আমার বাণী।"

এখন থেকে প্রায় এক-শো বছর আগের ঘটনা। গুজরাটের অন্তর্গত রাজকোটের একটি হাইস্কুল। একদিন এক ইন্সপেক্টর এলেন স্কুলটি পরিদর্শন করতে। একটি ক্লাসে ঢুকেই তিনি ছাত্রদের পরীক্ষা নিতে শুরু করলেন। লিখতে দিলেন কতকগুলি ইংরেজি শব্দ। ক্লাসের মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলেন কোন্ ছেলে কি লিখছে। খাতাগুলির উপর চোখ বুলতে বুলতে একটি ছেলের খাতায় একটি বানান-ভুল তাঁর নজরে পড়ল। ছেলেটি 'kettle' বানান ভুল লিখেছে। তখন তিনি জুতোর ডগা দিয়ে ছেলেটির পা মাড়িয়ে তাঁকে ইশারা করলেন পাশের ছেলের খাতা দেখে বানানটি ঠিক করে নিতে। ছাত্রটি ইশারার অর্থ বুঝলেন, কিন্তু অপরের খাতা দেখে বানানটি শুদ্ধ করতে চাইলেন না। মাস্টারমশাই বার বার ইঙ্গিত করলেন, কিন্তু ছাত্রটি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কিছুতেই তা করলেন না। তিনি ভাবলেন, যা তিনি নিজে জানেন না, তা অপরের দেখে কেন সংশোধন করবেন—ইহা অসত্য, অন্যায়। সেদিন পরীক্ষায় ঐ ছেলেটি ছাড়া আর সবাই বানান ঠিক করেছিল। মাস্টারমশাইয়ের ধারণা হয়েছিল ছেলেটি অত্যন্ত বোকা। আর ছেলেটি ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে তিনি একটি মস্ত বড় অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

কে এই অসামান্য বালক, অসত্যের প্রতি যাঁর তীব্র অনীহা, সত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা?

ইনিই মহাত্মা গান্ধী। পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইনি 'বাপুজী' এবং ভারতীয় 'জাতির জনক' প্রভৃতি নামেও অভিহিত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ইনিই ছিলেন আমাদের

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি। এঁর সংগ্রামের অস্ত্র ছিল বিশ্বে অভিনব— সত্য ও অহিংসা।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২ অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা করমচাঁদ গান্ধী বা কাবা গান্ধী সত্যবাদী, সাহসী ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। আর মাতা পুতুলীবাই ছিলেন বুদ্ধিমতী, ধর্মপ্রাণা ও সাধ্বী রমণী। গান্ধীজীর জীবনে তাঁর মা বাবার প্রভাব খুব বেশী। তিনিও বাল্যকাল থেকে সত্যবাদী ও তেজস্বী ছিলেন।

বাল্যে পোরবন্দরের এক স্কুলে মোহনদাসকে ভর্তি করা হয়। পড়াশোনায় তিনি মোটেই ভাল ছিলেন না। অঙ্কে ছিলেন খুব কাঁচার তাঁর বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল খুব কম। পড়া না পারার জন্য শিক্ষকরা প্রায়ই তাঁকে বকুনি দিতেন।

মোহনদাসের সাত বছর বয়সে তাঁর বাবা কাবা গান্ধী পোরবন্দর ছেড়ে রাজকোটে যান এবং সেখানকার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোহনদাসকে ভর্তি করে দেন। এখানেও তাঁর পড়াশোনার কোন উন্নতি হয়নি। বারো বছর বয়সে তিনি হাইস্কুলে ভর্তি হন। পড়াশোনা ভাল না পারলেও মোহনদাসের স্বভাব-চরিত্র ছিল খুব ভাল। ছাত্রজীবনে তিনি শিক্ষক বা সহপাঠী কারু সঙ্গে কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। এজন্য কারুর সঙ্গে মিশতে পারতেন না। পড়ার বইগুলি তাঁর একমাত্র সঙ্গী। স্কুল বসবার ঘণ্টা বাজলে তিনি ক্লাসে ঢুকতেন এবং ছুটির ঘণ্টা পড়লে সিধে দৌড়ে বাড়ি পালিয়ে যেতেন। ভয় ছিল, পাছে ছেলেদের কারুর সঙ্গে কথা বলতে হয়, গল্প করতে হয় এবং পাছে কেউ তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে।

ছাত্রজীবনে মোহনদাস কখনো কোন শিক্ষক বা সহপাঠীর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতেন না, কারুর নিন্দা করতেন না। গুরুজনদের দোষের বিষয় আলোচনা করা তিনি অপছন্দ করতেন। স্কুলের পড়ার বই ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়তেন না। মাস্টারমশাইয়ের বকুনির ভয়েই ক্লাসের প্রতিদিনের পড়া নিয়মিত তৈরী করতেন।

বাল্যের ছাত্রজীবনের দুটি ঘটনা মোহনদাসের মনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। একদিন তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে "শ্রবণের পিতৃভক্তি" নামক একখানা বই পেয়ে পড়ে ফেলেন। দিন কয়েক পরে একজন ম্যাজিক

কণ্ঠনে শ্রবণের পিতৃভক্তির ছবি দেখালো। মোহনদাসের মনে পিতৃভক্তির গভীর ছাপ পড়ল। তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন।

আর একদিন রাজকোটে হরিশ্চন্দ্র পালায় অভিনয় দেখলেন মোহনদাস। সত্যরক্ষার জন্য রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র সব ত্যাগ করলেন এবং শেষে নিজেকে বিক্রি করলেন এক চণ্ডালের কাছে। এই আদর্শে মোহনদাস অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হলেন।

তখনকার দিনে খুব কম বয়সে ছেলেদের বিয়ে হত। মাত্র তেরো বছর বয়সে মোহনদাসের বিয়ে হল। এতে তাঁর কিছুদিন পড়াশোনা নষ্ট হল। এক বছর পরে তিনি আবার হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। তখন তাঁর বুদ্ধির বিকাশ দেখা গেল। ক্লাসে আগের চেয়ে ভাল পড়াশোনা করার জন্য শিক্ষকদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। মাঝে মাঝে প্রাইজও পেতে লাগলেন। খুব সাধারণ ছাত্র ছিলেন বলে পুরস্কার পেলে অবাক হয়ে যেতেন। ছাত্রজীবনে বরাবরই তিনি নিজের চরিত্র সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। নিজের কোন কাজে অন্যায় হয়েছে দেখলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। একবার স্কুলে মার খেয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। মার খাওয়ার জন্য দুঃখ ছিল না। দুঃখ হয়েছিল অন্যায়ের জন্য মার খেলেন বলে।

গান্ধীজীর হাতের লেখা খুব খারাপ ছিল। এজন্য পরে তিনি খুব লজ্জা পেতেন এবং দুঃখও করতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, "ব্যায়ামে অবহেলা করার জন্য আমাকে যত না ভুগতে হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী ভুগতে হয়েছে হাতের অক্ষর ভাল না করায়। আমাকে আজও সেই অবহেলার ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে।...আমার হাতের লেখা ভাল করার জন্য অনেক চেষ্টা করি, তা আর হয়নি। আমার ছাত্রজীবনের অবহেলার জন্য যে ক্ষতি হয়েছিল, তা জীবনে আর কখনো শুধরাতে পারি নি। আমার দৃষ্টান্ত দেখে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সতর্ক হওয়া উচিত এবং মনে রাখা উচিত যে হাতের লেখাও লেখাপড়ার ন্যায় প্রয়োজনীয়।"

হাইস্কুলে পড়ার সময় জ্যামিতি এবং সংস্কৃত তাঁর পক্ষে খুব কঠিন মনে হত। মাঝে মাঝে এই দুটি বিষয় নিয়ে তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়তেন। হতাশার মধ্যেও খুব করে অভ্যাস করতে করতে বিষয় দুটি পরে তাঁর বেশ সহজ মনে হল।

হাইস্কুলে পড়ার সময় মোহনদাসের এক অসৎ সঙ্গী জুটল। সে তাঁকে মাংস খাওয়ার প্রলোভন দেখাল। মোহনের শরীর দুর্বল ছিল। সঙ্গীটি বলল, "দেখ মোহন, মাংস খাও না বলে তুমি এতো দুর্বল। আর ইংরেজরা মাংস খায়, তাই তারা এত সবল এবং আমাদের উপর রাজত্ব করে।" মোহনদাস অত্যন্ত ভীরু ছিলেন। সন্ধ্যে হলে ভয়ে ঘরের চৌকাঠ পার হতেন না। তাঁর এই ভীরুতা দূর করতে এবং বীর পুরুষ হওয়ার জন্য তিনি মাংস খাওয়া স্থির করলেন, যদিও বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে বলে মাংস খাওয়া তো দূরের কথা ছোঁয়াও তাঁদের পরিবারে নিষেধ। কিন্তু প্রলোভনে পড়ে একদিন মাংস খেলেন। খাওয়ার পর কেমন অসুস্থ বোধ করলেন। সেদিন রাতে ভাল ঘুম হল না। স্বপ্ন দেখলেন যেন একটা জ্যান্ত ছাগল তাঁর পেটের মধ্যে ছুটছে। তবুও কিছুদিন খেলেন। শেষে তাঁর খেয়াল হল যে মা-বাবা জানতে পারলে তাঁরা আত্মহত্যা করবেন। তখন তিনি বন্ধুকে বলে মাংস খাওয়া ত্যাগ করলেন।

আর একবার অন্য এক সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে বিড়ি খাওয়া ধরেছিলেন। এজন্য বাড়ির চাকরদের পকেট থেকে দু-এক পয়সা চুরি করতেন। পরে বিরক্ত হয়ে বিড়ি ছেড়ে দেন। এই সময় তাঁর জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মায়। তিনি আত্মহত্যা করবেন স্থির করেন। এজন্য কিছু ধুতুরার বীচিও সংগ্রহ করেছিলেন। পরে ভাবলেন মরে কি লাভ, বেঁচে থাকাই ভাল।

এরপর মোহনদাসের মনে বড় অনুশোচনা দেখা দিল। স্থির করলেন সব ঘটনা লিখে বাবাকে জানাবেন। অন্যায় স্বীকার করে মাফ চাইবেন, সাজাও নেবেন এবং আর কখনো কোন অন্যায় না করার প্রতিশ্রুতি দেবেন। একদিন এক টুকরো কাগজে সব কথা লিখে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাবার ঘরে ঢুকলেন এবং চিঠিটা তাঁর হাতে দিলেন। তাঁর বাবা তখন খুব অসুস্থ ছিলেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে পিতার দু-চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। চোখের জলে চিঠিটা ভিজে গেল। তিনি একটুখানির জন্য চোখ বুজলেন। তারপর চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন। আর কিছুই বললেন না মোহনদাসকে। পুত্রের এই সত্যবাদিতার জন্য পিতা খুশী হলেন। এরপর থেকে মোহন-দাসকে তিনি খুব স্নেহ করতেন।

কিছুদিন পরে মোহনদাস এনট্রান্স পাস করে ভবনগর কলেজে পড়তে

গেলেন। কিন্তু কলেজের পড়াশোনা বুঝতে না পারায় বাড়ি ফিরে আসেন। তারপর আইন পড়ার জন্য বিলেতে গেলেন। যাওয়ার আগে মায়ের কাছে

শপথ করে গেলেন যে বিলেতে থাকাকালে তিনি মদ, মাংস খাবেন না, আর পর-স্ত্রীকে মা-বোনের মতো দেখবেন এবং ভালভাবে থাকবেন। বিলেতে থাকাকালে এই শপথ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। সেখানকার আচার-আচরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারায় তিনি প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা বোধ করতেন। তাঁর লাজুক ভাব ও সহজ সরল ব্যবহারের জন্য সবাই তাঁকে গেঁয়ো, অসভ্য বলে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। মোহনদাস কিন্তু তাঁর সংকল্পে অটল অচল ছিলেন। নানা পাপ প্রলোভনের মধ্যেও নিজেকে ঠিক রেখেছিলেন। স্বধর্ম ও জাতীয়তা তিনি কখনো ত্যাগ করেন নি। ইহা বিলেত-যাত্রী যে-কোন ছাত্রের পক্ষে মস্ত বড় শিক্ষার বিষয়।

ব্যারিস্টারি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলেতে মোহনদাস ফ্রেঞ্চ ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং ওখানকার ম্যাট্রিক পরীক্ষায়ও পাস করেন। শেষে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসেন। বিলেতে অবস্থানকালে একবার বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর লাজুক স্বভাবের জন্য তিনি কিছুই করতে পারেন নি। অথচ পরবর্তী জীবনে বক্তৃতা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে মাতিয়ে তুলতেন।

পড়াশোনার দিক থেকে গান্ধীজীর ছাত্রজীবন একেবারে সাধারণ হলেও, চরিত্রগঠনের দিক থেকে উহা ছিল অসাধারণ। তাই গান্ধীজীর ছাত্রজীবন সকল যুগের সকল দেশের ছাত্রসমাজের অনুকরণযোগ্য। ছাত্রজীবনে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই তো হল চরিত্রগঠন। গান্ধীজী তাঁর ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠন করেছিলেন বলে পরে এত বড় হতে পেরেছিলেন।

# দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

"দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি,
চেয়ে দেখ আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণচুমি "

একদিন সকালবেলা এক কিশোর তার পড়ার ঘরে মিষ্টি গলায় সুর করে একমনে পড়ছে ঃ

আমাদের দেশে হবে, সেই ছেলে কবে।
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন,
মানুষ হইতে হবে এই যার পণ।

ছেলেটির জ্যাঠামশাই বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। পড়া শেষ হলে ঘরে ঢুকে স্নেহভরে বললেন—এতক্ষণ যে কবিতাটি পড়লে তার মানে বুঝতে পেরেছ? বালক উত্তর দিল—হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই, এতো খুব সহজ। জ্যাঠামশাই বললেন—না, সে কথা বলছি না। আমি বলছি তোমাকে এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে, সঙ্কল্প নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে বড় হতে পার, বংশের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পার। বালক তখন কেবল ঘাড় নেড়েছিল।

এই কিশোরই চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশ ও দশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে 'দেশবন্ধু' নামে ভারতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে গেছেন।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৫ নভেম্বর মধ্য কলকাতার পটলডাঙায় চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁর পিতৃভূমি ছিল পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকা জেলার বিখ্যাত বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রাম। পিতা ভুবনমোহন ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত এটর্নী। প্রচুর আয় করতেন। আর জলের মতো দান করতেন। তিনি ছিলেন দয়ালু, দাতা, দেশপ্রেমিক ও চরিত্রবান মানুষ। মাতা নিস্তারিণী

দেবী ছিলেন উদারহৃদয়া, পরদুঃখকাতরা, দানশীলা মহীয়সী মহিলা। পিতামাতার সব গুণই চিত্তরঞ্জন লাভ করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের প্রাথমিক শিক্ষা বাড়িতেই শুরু হয়। আট বছর বয়সে ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। ছোটবেলা থেকেই চিত্তরঞ্জনের মধ্যে নেতা হওয়ার মনোভাব দেখা যায়—কি বাড়িতে কি স্কুলে। তিনি এতোই বিচক্ষণ ছিলেন যে, তাঁর কথা সবাই মেনে চলত। সকলের ঝগড়া-বিবাদ তিনি মিটিয়ে দিতেন। স্কুল-জীবনে তিনি সকল বিষয়েই ছিলেন তাঁর সহপাঠীদের অগ্রণী। স্কুলের সাহিত্যসভা, বিতর্কসভা সবকিছুরই তিনি ছিলেন মধ্যমণি। সব ছেলেই তাঁকে ভালবাসত, তাঁর কথা মেনে চলত। ছোটবেলা থেকেই চিত্তরঞ্জন পরদুঃখে কাতর হতেন। অনেক দিন নিজের টিফিনের পয়সায় গরীব অভুক্ত ছেলেকে খাওয়াতেন। স্কুল থেকে ফিরে এলে তাঁর শুকনো মুখ দেখে মা জিজ্ঞেস করলে সজল চোখে বলতেন, "মা, আমি তো ভাত খেয়ে স্কুলে গেছি, কিন্তু ও যে ভাত খেতেও পায় নি।"

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা ও কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং বন্ধুদেরও উৎসাহিত করতেন। ঐ সময়ে তাঁর রচিত একটি দেশপ্রেমমূলক কবিতা এইরূপ—

ভক্তিপুষ্প দিয়ে মাগো
গাঁথিয়াছি হৃদিহার।
বড় সাধ দিব তুলে
ওই চরণে তোমার॥

স্কুল-জীবনে চিত্তরঞ্জন সকল বিষয়ে ছিলেন তাঁর সহপাঠীদের অগ্রণী। তিনি মোটেই শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির ছেলে ছিলেন না। তিনি ছিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁর এক সহপাঠী লিখেছেন: "তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রাচুর্য আর মনের সজীবতা চিত্তকে যেন আমাদের সকলের আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তাঁকে আমরা দেখতাম সদা উৎফুল্ল—তাঁর পাশে বসলেই আমরা অনুভব করতাম একটা সজীব ভাব।"

ষোল বছর বয়সে চিত্তরঞ্জন এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কলেজের পড়াশুনায় তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। স্কুলের ন্যায় কলেজেও বাইরের বই পড়ার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক

ছিল। ইংরেজি, বাংলা বহু ভাল ভাল বই তিনি পড়তেন। কলেজে এসেই তিনি বিতর্কসভা, সাহিত্যসভা ও ছাত্রসভা প্রভৃতির নানা কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকতেন এবং ছাত্রমহলের বিশেষ প্রিয় হয়েছিলেন। প্রত্যেকটি সভায় তিনি অতি সুন্দর বক্তৃতা দিতেন। বিতর্কসভায় তাঁর বিশেষ নাম ছিল। ইংরেজি ভাষা তিনি খুব ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। মতৃভাষা বাংলার প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষাকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি বাংলা সাহিত্য সাধনায় বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা, বিতর্কশক্তি ও সাহিত্য-সৃষ্টি ছাত্র, শিক্ষক সকলকে বিস্মিত করত।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে বি, এ, পাস করে চিত্তরঞ্জন চললেন বিলেতে আই, সি, এস, পরীক্ষা দিতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক চর্চায় মেতে উঠলেন। এতে তাঁর পড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং আই, সি, এস, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। তখন তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে আরম্ভ করেন। চিত্তরঞ্জনের বিলেতে অবস্থানকালে ভারতের তৎকালীন খ্যাতনামা দেশনেতা দাদাভাই নৌরজী বিলেতের পার্লামেণ্টে সভ্যপদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর পক্ষে বহু সভাসমিতিতে বক্তৃতা করেন এবং বিলেতে বক্তা হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। একবার দাদাভাই-এর প্রতিদ্বন্দ্বী দাদাভাইকে 'ভারতের কালা আদমী' বলে হীন কটাক্ষ করেছিল। চিত্তরঞ্জন এর সমুচিত জবাব দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। নির্বাচনে দাদাভাই জয়লাভ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসেন (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে) এবং কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি।

# মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ

"হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি।"

দার্জিলিং-এর খাঁটি ইংরেজি স্কুল লরেটো কনভেণ্ট। বার্ষিক পরীক্ষার পর ক্লাস প্রমোশন হয়ে গেছে। বড়দিনের ছুটি পড়েছে। সব ছাত্র-ছাত্রী বাড়ি চলে গেল। আপন দুই দাদাও গেলেন কলকাতায়। গেলেন না কেবল ছ-বছরের একটি ছেলে। প্রধান শিক্ষকমশাইয়ের অতি প্রিয় ছাত্র তিনি। ছেলের মতো স্নেহ করেন তাঁকে। ছেলেটি ছুটিতে থাকলেন খুব করে পড়াশোনা করবেন বলে। ছুটিতে প্রতিদিন প্রধান শিক্ষকমশাই ছেলেটিকে নিয়ে সকালে-বিকেলে বেড়াতে যান। একদিন খুব সকালে তাঁকে নিয়ে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয় দেখালেন। সুবিশাল হিমালয়ের তুষারশুভ্র শিখরে সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্যে বালকের মন বিমুগ্ধ হল। বাসায় ফিরে বালক দশ লাইনের একটি কবিতা লিখলেন ইংরেজিতে। পরের দিন সকালে প্রধান শিক্ষকমশাই তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয় তাঁর কেমন লাগল, তখন তিনি বললেন, 'ভেরি নাইস, স্যার'। এই বলে তাঁর জামার বুক পকেট থেকে পেনসিল দিয়ে লেখা এই রচনাটি সলজ্জভাবে বার করে দিলেন। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সেটি পড়লেন প্রধান শিক্ষকমশাই। তারপর ছাত্রের পিঠ চাপড়িয়ে তিনি বললেন, 'বড়ো হয়ে তুমি নিশ্চয়ই একজন বড় কবি হবে।'

এই অসাধারণ বালকের নাম অরবিন্দ ঘোষ। পরবর্তীকালের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের অমর কবি শ্রীঅরবিন্দ। প্রথম জীবনে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পরে দেশের ও সারা বিশ্বের

মানুষের মঙ্গলের জন্য সাধনা করে গেছেন। ভারতের অতীত গৌরবের কথা বিশ্বের নিকট প্রচার করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

কলকাতা শহরে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন কলকাতার নিকটবর্তী হুগলী জেলার কোন্নগর অঞ্চলের প্রাচীন ঘোষ-পরিবারের কৃতী সন্তান কৃষ্ণধন ঘোষ, লোকে বলত ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ। ইনি ছিলেন বিলেত-ফেরত ডাক্তার, অত্যন্ত উদার-হৃদয়, দেশ ও লোকহিতৈষী। গরীবদের ইনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতেন এবং মুক্তহস্তে দান করতেন। তাই লোকে বলত তাঁকে 'দাতা-কর্ণ'। আর মাতা ছিলেন কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা, পরম জ্ঞানী, ঈশ্বরভক্ত ও দেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতা। ইনি ছিলেন তখনকার দিনের প্রগতিশীলা শিক্ষিতা নারী। সাহিত্যে ও কাব্যে তাঁর বেশ দখল ছিল।

অরবিন্দের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁকে দেশের সেরা ইংরেজি স্কুল দার্জিলিং-এর লরেটো কনভেণ্টে ভর্তি করা হয়। এখানে তাঁর দু-দাদাও পড়তেন। অরবিন্দের মুখে ইংরেজি উচ্চারণ শুনে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক সবাই অবাক হতেন। মাত্র দু-বছর এখানে পড়েছিলেন অরবিন্দ। কিন্তু তাঁর সুন্দর আচার-আচরণ ও প্রতিভা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অরবিন্দের সাত বছর বয়সে তাঁর পিতা কৃষ্ণধন তাঁকে ও তাঁর দু-দাদা বিনয়ভূষণ ও মনোমোহনকে বিলেতে রেখে এলেন সম্পূর্ণ বিলিতি কায়দায় মানুষ করার জন্য। তাঁরা সবাই ড্রুয়েট পরিবারে বাস করতেন। অরবিন্দ মি. ড্রুয়েটের কাছে লাটিন এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে ইংরেজি শিখতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে দুই ভাষাই তিনি সুন্দর আয়ত্ত করেন। এই সময় দেখা যেত তাঁকে যা কিছু শেখানো যায়, অতি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলেন। কোন বিষয় একবার পড়লেই তাঁর মনে গেঁথে যেত। দশ বছর বয়সেই তিনি লাটিন ও ইংরেজি ভাষায় ভালো ভালো কবিতা লিখতে শুরু করে দিলেন।

তেরো বছর বয়সে অরবিন্দ লণ্ডনে সেণ্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি হন। লাটিন ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেখে প্রধান শিক্ষকমশাই তাঁকে গ্রীক ভাষা শেখাতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এ-ভাষাটিও আয়ত্ত করে ফেললেন। এই স্কুলে পাঁচ বছর পড়াশোনা করার পর অরবিন্দ

বৃত্তি নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন এবং তারপর কেমব্রিজ কিংস কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁর মেধার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের স্বনামধন্য কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর স্বনামধন্য পুত্র অস্কার ব্রাউনিং দীর্ঘকাল এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রাচীন সাহিত্যের উপর অরবিন্দের উত্তরপত্র দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর সুদীর্ঘ পরীক্ষক-জীবনে তিনি এতো সুন্দর উত্তরপত্র কখনো দেখেননি। তাঁর বিবেচনায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একমাত্র অরবিন্দের রচনাই এক্সেলেন্ট বা সর্বশ্রেষ্ঠ। কলেজে এক বছরের মধ্যেই লাতিন ও গ্রীক কবিতার জন্য যতগুলি প্রাইজ ছিল তার সব কটিই অরবিন্দ লাভ করেন। সহপাঠী ইংরেজ ছাত্ররা তাঁর এই কৃতিত্ব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর নিরহঙ্কার বিনয়পূর্ণ সুন্দর আচরণ সকলকে মুগ্ধ করত। তাঁর শিক্ষকদের মতে তিনি ছিলেন এক দুর্লভ চরিত্রের বালক।

বিলেতের ছাত্রজীবনে অরবিন্দ কারুর সঙ্গে মিশতেন না। বই-ই ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী। তিনি অবসর সময় ইংরেজি কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস, ফরাসী সাহিত্য, য়ুরোপের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক ইতিহাস পাঠে অতিবাহিত করেছেন। ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, স্প্যানিস্ ভাষাও শিক্ষা করেছেন। আর রচনা করেছেন বহু কবিতা তাঁর ছাত্রজীবনের বিশেষত্ব ছিল সবকিছু একাগ্রচিত্তে আয়ত্ত করা। তাই তিনি অতি অল্প বয়সেই অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পাঠ্য বিষয় নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামাতেন না। অথচ পরীক্ষায় সমানে বৃত্তি ও প্রাইজ পেয়েছেন। কিংস্ কলেজের ট্রাইপস্ পরীক্ষার প্রথম অংশে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে প্রথম হন। কিন্তু দ্বিতীয় অংশের পরীক্ষা না দেওয়ায় তিনি ডিগ্রি লাভ করেন নি। ডিগ্রির প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান লাভ করা। পিতার নির্দেশ মতো তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় হাজির না হওয়ায় তিনি আই. সি. এস. হতে পারেন নি। ইচ্ছা করেই তিনি হাজির হন নি। কারণ, ইংরেজের অধীনে চাকরি করা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বড় চাকরি করবেন এবং সুখে থাকবেন একথা তিনি ভাবতে পারতেন না। তিনি ভাবতেন পরাধীন

ভারতের ও সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণের কথা। তিনি সব সময় অনুভব করতেন কোন কিছু বড় কাজ করার জন্য যেন তাঁর জন্ম হয়েছে। তাই তো তিনি অগাধ পড়াশোনা করে বহু কিছু জানতে চাইতেন।

বিলেতের ছাত্রজীবনে অরবিন্দ ভারতের দুঃখ-দুর্দশার খবর রাখতেন। দেশকে স্বাধীন করার উপায় ভাবতেন। পড়তেন অন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। কেম্ব্রিজে ভারতীয় যুবকদের এক আড্ডা ছিল, তার নাম "ভারতীয় মজলিশ"। অরবিন্দ তাতে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। পরে "লোটাস য়্যাণ্ড ড্যাগার" (কমল ও কৃপাণ) নামে বিপ্লববাদীদের এক গুপ্তসমিতি গড়ে ওঠে। অরবিন্দ ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। এখানে প্রত্যেক সভ্য এই বলে শপথ গ্রহণ করে যে, প্রত্যেকেই ভারতের মুক্তির জন্য কাজ করবে এবং এজন্য বিশেষ ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। অরবিন্দ এই শপথ সম্পূর্ণ পালন করেছিলেন পরবর্তী জীবনে।

অরবিন্দ সাত বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত বিলেতের বিজাতি আবহাওয়ায় মানুষ হচ্ছিলেন। কিন্তু বিলেতের বিলাসিতা বা আদব-কায়দা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তিনি অত্যন্ত সাদা-সিধে জীবনযাপন করতেন; কিন্তু বিদেশের জ্ঞান-বিদ্যা তিনি ষোলকলায় আয়ত্ত করেছিলেন। ইহাই তাঁর ছাত্রজীবনের বিশেষত্ব।

দীর্ঘ চোদ্দ বছর বিদেশে অবস্থান করে অরবিন্দের মন মাতৃভূমি ভারতের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। অবশেষে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বরোদা মহারাজের অধীনে একটি চাকরি গ্রহণ করেন। এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি এবং কর্ম-জীবনের উৎপত্তি।

## কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

হুগলী জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। নাম দেবানন্দপুর। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিদিন পাঠশালা বসে। পণ্ডিতমশাই প্রচণ্ড রাগী। হাতে থাকে তাঁর লিক্‌লিকে একটা বেত। কেউ দুষ্টুমি করলে তার আর রক্ষে থাকে না। একদিন রোগা একটি ছেলে এসে ভর্তি হল ঐ পাঠশালায়। ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান। পড়াশোনায় ভাল। পণ্ডিতমশাই যা প্রশ্ন করেন টপাটপ উত্তর দিয়ে দেয়। কিন্তু সে অত্যন্ত দুরন্ত। তার দৌরাত্ম্যে গ্রামের লোক থেকে পাঠশালার গুরুমশাই ও ছাত্ররা সবাই অতিষ্ঠ। কি ভাবে কখন কাকে জব্দ করবে, সেই মতলব ঘুরছে সব সময় তার মাথায়।

পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল ধূমপানের দারুণ নেশা। অনবরত হুঁকো টানতেন। কল্‌কের আগুন নিভত না বললেই চলে। একদিন গুরুমশাই ধূমপানের আগে কল্‌কেয় তামাক ও টিকে সাজিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন। দুষ্টু ছেলেটি সেই ফাঁকে কল্‌কের তামাক ফেলে দিয়ে তামাকের বদলে ছোট ছোট ইঁটের টুকরো রেখে দিল। গুরুমশাই ফিরে এসে টিকে ধরিয়ে কল্‌কে হুঁকোয় বসিয়ে খুব করে টানতে লাগলেন; কিন্তু ধোঁয়া আর কিছুতেই বার হয় না। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে তিনি কল্‌কে উপুড় করে ঢেলে ফেললেন। দেখলেন, তামাকের বদলে ইঁটের টুক্‌রো। রাগে অগ্নিশর্মা মূর্তি ধরলেন গুরুমশাই। এতে অত্যন্ত ভয় পেয়ে একটি ছেলে ঐ দুষ্টু ছেলেটির নাম বলে দিল। অমনি গুরুমশাই বেতহাতে তাকে তেড়ে গেলেন। ততক্ষণে দুষ্টু ছেলেটি অন্য ছাত্রটিকে ধাক্কা

মেরে ফেলে দিয়ে গুরুমশাইয়ের নাগালের বাইরে চলে গেল। এইভাবে সে পাঠশালায় এক একদিন এক এক কাণ্ড বাধিয়ে আসত। এতে তার মা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়তেন। তাঁর ভাবনা হত তাঁর এ-ছেলে কি আর মানুষ হবে? তাঁর শ্বাশুড়ী অর্থাৎ দুষ্টু ছেলেটির ঠাকুমা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—'বৌমা, আমি বলছি, তুমি দেখো, তোমার এ ছেলের মতিগতি একদিন ফিরবে, ও দশের মধ্যে একজন বলে গণ্য।'

ঠাকুমার কথা মিথ্যা হয়নি। সেদিনের সেই দুরন্ত বালক পরবর্তী-কালে সত্যই দেশবরেণ্য ব্যক্তি হয়েছিলেন। ইনিই অমর ও মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সমাজের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা তাঁর সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে তাঁর সাহিত্য বিশেষ আদৃত। বাংলা সাহিত্যে তথা উপন্যাস জগতে তাঁর দান অসামান্য। তিনি কেবল একজন বড় সাহিত্যিকই ছিলেন না, একজন বড় দেশপ্রেমিকও ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ভুবন-মোহিনী দেবী। মতিলাল ছিলেন কল্পনাপ্রবণ, উদাসীন, আত্মভোলা ও অস্থির প্রকৃতির মানুষ। সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। পিতার এইসব গুণ শরৎচন্দ্রের মধ্যেও দেখা যেত।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের ডাক নাম ছিল 'ন্যাড়া' অথবা 'ল্যাড়া'। শিশু অবস্থায় একবার তাঁর মাথায় ফোড়া ও ঘা হয়। ফলে তাঁর মাথার অনেক চুল উঠে যায়। তাই তাঁর ঠাকুমা তাঁকে আদর করে ন্যাড়া বলে ডাকতেন। ছোট বেলায় শরৎচন্দ্র বিহারের ভাগলপুরে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে ছিলেন। সেইখানেই তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ হয়। তারপর প্রায় পাঁচ বছর বয়সে দেবানন্দপুরে আসেন এবং সেখানে একাধিক স্কুলে পড়াশোনা করেন। বাল্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত কিন্তু দারুণ মেধাবী। এতো দুরন্তপনার মধ্যেও তিনি পড়াশোনা ভালই করতেন। দশ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র আবার ভাগলপুরে যান এবং স্থানীয় দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলের ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হন। এই স্কুলে শরৎচন্দ্র পড়াশোনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বছরের শেষে তিনি প্রথম হয়ে ডবল প্রমোশন পান।

অবসর সময়ে তিনি গোপনে সাহিত্যচর্চা করতেন; কিন্তু অধ্যয়নে তাঁর কিছু মাত্র শিথিলতা ছিল না।

ভাগলপুরে মামার বাড়িতে রাত্রে ফরাশ পেতে অনেক ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়তে বসত। তাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রও থাকতেন। বাড়ির বারান্দায় দাদামশাই খাটিয়ার উপর শুয়ে কড়া নজর রাখতেন। তিনি বেরিয়ে গেলে বালক শরৎচন্দ্রের মুখে এক ইংরেজি ছড়া শোনা যেত—

ক্যাট ইজ আউট,—
লেট মাইস প্লে…

তখন অন্যেরা সমবেত স্বরে বলত—

ড্যান্স লিট্‌ল বেবি ড্যান্স আপ হাই
নেভার মাইন্‌ড বেবি, মাদার ইজ নাই।

কিশোর শরৎচন্দ্রের চেহারা ছিল রোগা প্যাকাটে ধরনের। পা দুটি ছিল সরু এবং ক্ষিপ্রগতি। তাঁর বুদ্ধি ছিল শাণিত ও উজ্জ্বল; কিন্তু ত নিত্য নতুন দুষ্টুমি ও দৌরাত্ম্য-পথেই চালিত হত। তিনি ছিলেন যত সব দুরন্ত ছেলের দলের সর্দার। তারা তাঁর কথা বেদবাক্যের মতো মেনে চলত। খেলাধূলা ও ব্যায়ামে শরৎচন্দ্র ছিলেন অগ্রণী। খেলার মাঠে তিনি হতেন প্রধান। একটা পোড়ো বাড়ি ভূতের বাড়ি বলে খ্যাত ছিল। সে বাড়ির উঠোনে শরৎচন্দ্রের ছিল ব্যায়ামের আখড়া। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। দেবানন্দপুরে সরস্বতী নদীতে এবং ভাগলপুরে গঙ্গায় সাঁতার ছিল তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস। গাছে উঠা ও গাছের উপর ঘুমনো তাঁর এক খেলা ছিল। তাছাড়া, ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু ঘোরানো, গুলি খেলা, ফড়িং ধরা, ফড়িং পোষা, নদীতে মাছ ধরা প্রভৃতি ছিল তাঁর ছোট বেলার খেলা। নদী, মাঠ ও বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর সাহস ছিল অসীম ও দুর্জয়। ঘোর অন্ধকার রাতে, এমনকি দুর্যোগপূর্ণ রাতে যখন মানুষ তো দূরের কথা, শেয়াল-কুকুর পর্যন্ত বাইরে বেরোতে ভয় পেতো, নির্ভীক শরৎচন্দ্র তখন অপরের বাগানে ঢুকে ফল, ফুল সংগ্রহ করতেন।

দুর্দান্ত এবং বেপরোয়া হলেও শরৎচন্দ্রের মন ছিল অতিশয় কোমল ও দরদী। যারা অক্ষম, পীড়িত ও নিগৃহীত তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও মমতা

ছিল অপরিসীম। গ্রামে হয়তো কারুর অসুখ হয়েছে, শহর থেকে ওষুধ আনতে হবে রাতে, শরৎচন্দ্র এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে লণ্ঠন নিয়ে গ্রাম হতে বার হতেন। এতে তাঁর বিন্দুমাত্র বিরক্তি ছিল না, বরং উৎসাহ ছিল প্রচুর। এজন্য তাঁর দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে উঠলেও সবাই তাঁকে খুব ভালবাসত। তাছাড়া, তাঁর চরিত্রে এমন একটা গুণ ছিল যাতে তাঁর শিক্ষকরাও স্নেহ করতেন।

তেরো বছর বয়সে শরৎচন্দ্র আবার দেবানন্দপুরে ফিরে আসেন এবং হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন তাঁদের বাড়ির অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠে। নিদারুণ অর্থাভাবে শরৎচন্দ্রের পড়াশোনার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। ঐ সময় তিনি প্রায়ই ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হতেন।

ছেলেবেলা থেকেই গান, বাজনা ও অভিনয়ের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঝোঁক ছিল। গ্রামের একটি নাট্যসমিতিতে যোগ দিয়ে তাঁর অভিনয়ের দ্বারা দর্শকবৃন্দকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে দেন। স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ ও অতুলনীয়। তিনি খুব ভাল বাঁশী বাজাতে ও আবৃত্তি করতে পারতেন।

শরৎচন্দ্র যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি সাহিত্য সাধনায় বিশেষভাবে মগ্ন হন। এই সময় তিনি লিখতে শুরু করেন 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা' নামক দুটি গল্প। দারিদ্র্যদশা যখন চরমে পৌঁছল, তখন শরৎচন্দ্রের পরিবার দেবানন্দপুর ছেড়ে আবার ভাগলপুর গেলেন। দেবানন্দপুরে থাকতে শরৎচন্দ্রের পড়াশোনার খুব ক্ষতি হয়েছিল, এখন তিনি দিনরাত খেটে পড়তে লাগলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখানেও নানা অসুবিধা এবং আর্থিক অভাব। মামার বাড়ির বাইরের একটি ঘরে বাসা বাঁধলেন। শোবার জন্য ছিল একটি ছেঁড়া দড়ির খাট। প্রদীপ জ্বালাবার তেল জুটত না। বন্ধুবান্ধবরা মোমবাতি যোগাড় করে দিত। বই কেনার সঙ্গতি ছিল না। সহপাঠীদের সহযোগিতায় সে অভাব ঘুচত। তাঁর পরনে থাকত ছেঁড়া ময়লা জামা আর ময়লা কাপড়। তাঁর ঘরে ইঁদুরের খুব উৎপাত ছিল। তিনি একটি বেজি পুষেছিলেন। শোবার আগে শরৎচন্দ্র বেজিটিকে ঘরের মধ্যে ছেড়ে রাখতেন। একদিন

অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে শুয়ে পড়েন। সকালে উঠে দেখতে পেলেন বেজিটি ঘরের মধ্যে একটি গোখুরো সাপ মেরে রেখেছে।

শরৎচন্দ্র টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অনেক কষ্টে পরীক্ষার ফি যোগাড় হল। যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাস করলেন এবং ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হলেন। এই সময় তিনি ইংরেজি, বাংলা খুব পড়তেন। কোনো বই পড়বার সময় তিনি একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন। তাঁর একাগ্রতা ছিল অসাধারণ, স্মৃতিশক্তিও ছিল প্রখর। একবার বিজ্ঞানের একটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রাত জেগে পড়ছিলেন দরজা জানলা বন্ধ করে। রাত একেবারে কাবার হয়ে গেলেও সেদিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। তাঁর পরীক্ষার ফল দেখে অধ্যাপক বিস্মিত হন। তাঁর সন্দেহ হল শরৎচন্দ্র হয়তো নকল করে থাকবেন। তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে সামনে বসিয়ে লিখিয়ে দেখলেন উত্তর একই প্রকার। এতে তাঁর বিস্ময় আরও বেড়ে গেল।

কলেজ-জীবনে শরৎচন্দ্রের বিশেষ মেধা ও পাঠস্পৃহা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি। কারণ, পরীক্ষার ফি কুড়িটি টাকা সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি।

# ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে

"ভাষার অন্তহীন রহস্যে তাঁর অনন্ত পরিক্রমণ ছিল আমরণ।"

একদিন এক মা তাঁর বাড়ির কাজকর্ম করার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর পাঁচ বছরের এক ছোট্ট ছেলেকে বাংলা বর্ণমালার এক একটি অক্ষর চিনিয়ে দিচ্ছিলেন। আর ছেলেটি অক্ষরগুলো একে একে চিনে নিয়ে এক টুকরো কাঠ কয়লা দিয়ে সারা বাড়ির মেঝে—মায় দেওয়ালগুলো পর্যন্ত লিখে লিখে ভরিয়ে তুলছিলেন। এইভাবে একদিনেই ঐ শিশুটির বাংলা বর্ণমালার সব অক্ষর শেখা হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে, বালক অসাধারণ প্রতিভাবান। নাম হরিনাথ দে। পরবর্তীকালে ইনি মনীষী হরিনাথ দে নামে সমধিক পরিচিত। মাত্র চৌত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ঐ অত্যল্পকালের মধ্যেই বিশ্বের চৌত্রিশটি ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বহু ভাষাবিদ্ মনীষীরূপে তাঁর নাম লোকমুখে কিংবদন্তীর মতো প্রচলিত। কেবল পাণ্ডিত্যেই নয়, বিনয়, সহৃদয়তা, দানে, স্বাদেশিকতায় ও মহানুভবতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নানা বিষয়ে এতো জ্ঞান ছিল তাঁর যে তিনি ছিলেন যেন একটি জীবন্ত গ্রন্থশালা। তাই তাঁর অকাল মৃত্যুতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন :

"যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব,—শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা,<br>
যাচ্ছে পুড়ে নূতন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।"

হরিনাথ দের জন্ম হয় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ আগস্ট চব্বিশ পরগণা জেলার আড়িয়াদহ গ্রামে মামার বাড়িতে। মা এলোকেশী দেবী আড়িয়াদহের

উমাচরণ মিত্রের ছোট মেয়ে। হরিনাথের বাবা রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর মধ্য প্রদেশের রায়পুরে একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন।

রায়পুরেই হরিনাথের বাল্য শিক্ষা শুরু হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি কিন্তু মোটেই তথাকথিত ভাল ছেলে ছিলেন না। অঙ্কে ছিলেন খুবই কাঁচা। বিদ্যালয়ে ভাল অঙ্ক কষতে না পারায় শাস্তি হিসেবে তাঁকে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে খাতা বা বই নাকের উপর চেপে রাখতে হত। আর শিক্ষকমশাই মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে বলতেন—'নাক পর চিপ্‌কাকে রাখো।' এই অপমানকর শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বালক হরিনাথকে স্কুল কামাই করে প্রায়ই 'কোম্পানির বাগানে' বসে থাকতে দেখা যেত। এই ব্যর্থতার জন্য মনে মনে তাঁর বড় দুঃখও হত।

শীঘ্রই সংকল্প নিলেন তাঁর ছাত্রজীবনের এই অপবাদ তিনি দূর করবেনই। অঙ্কে কাঁচা ছিলেন বলে এখন থেকে অঙ্ক খুব করে অভ্যাস করতে লাগলেন। ফলে বিদ্যালয়ের পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে তিনি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতে থাকলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে মিডল স্কুল পরীক্ষায় হরিনাথ একটি বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৮৯১ সালে কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন এবং পরের বছর একটি বৃত্তি নিয়ে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে একটি বৃত্তি নিয়ে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় পাস করেন। লাটিন ও ইংরেজি ভাষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ডাফ্ স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৮৯৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় লাটিন ও ইংরেজি অনার্সে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও চতুর্থ হন। ঐ বছরই প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিনে এম,এ, পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরের বছর গ্রীক ভাষায় এম, এ, পরীক্ষা দেন। এতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে আবার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৮৯৭ সালে হরিনাথ ইংলণ্ড যান এবং ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। সেখানে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তিনি বহু পুরস্কার লাভ করেছিলেন। প্রখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপকরা ভাষা ও সাহিত্যে তরুণ হরিনাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

লাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করে তিনি অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ সালে তিনি কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজের সিনিয়র স্কলার নির্বাচিত হন। কেম্‌ব্রিজের প্রখ্যাত অধ্যাপকমহল এবং হরিনাথের ইংরেজ সহপাঠীরা একবাক্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। তাঁর এক সহপাঠী ও পরবর্তীকালের বিখ্যাত লেখক জন ক্লার্ক স্টোবার্ট বলেছিলেন, "আমরাও স্কলার ছিলাম, কিন্তু হরিনাথ দের তুলনায় অতি নগণ্য।" স্বনামধন্য অধ্যাপক হেনরি জন এডওয়ার্ডস বলতেন, "গত পঁয়ত্রিশ বছরের অধ্যাপক-জীবনে হরিনাথ দের মতো অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র আমি আর একটিও দেখি নি।...যে কোনও আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষায় লেখা কবিতার তিনি লাটিন ও গ্রীকে চার পাঁচটি বিভিন্ন ছন্দে এক জায়গায় বসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করতে পারতেন। এটি যথার্থ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।"

ভাষায় ছিল হরিনাথের অসাধারণ তীক্ষ্ণ প্রতিভা। কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজের ছাত্রাবস্থায় মাত্র একুশ বছর বয়সে লাটিন ও গ্রীকের মতো সুকঠিন ভাষায় মৌল কবিতা লিখে হরিনাথ যে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং লোভনীয় সব পুরস্কার লাভ করেছিলেন তা বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে বিস্ময়ের বিষয় ছিল। তাঁর ন্যায় অলৌকিক স্মৃতিশক্তি স্বদেশে কি বিদেশে কোনও ভাষাবিদেরই দেখা যেত না। হরিনাথ যখন নতুন কোনও ভাষা শিক্ষায় ব্রতী হতেন, তখন তিনি কিছু শব্দ বাদ দিয়ে একটি শব্দকোষকেই কয়েকবারের পাঠে আত্মসাৎ করতেন। লাটিনের ন্যায় দুরূহ ভাষার নাটকে হরিনাথের এমন অসামান্য অধিকার ছিল যে যে-কোন লাটিন নাটক থেকে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করলে পরের পঙ্‌ক্তিগুলি তিনি বলে যেতে পারতেন।

কেবল পরীক্ষা পাস এবং ডিগ্রি লাভের মধ্য দিয়েই হরিনাথের গৌরবদীপ্ত ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। প্রকৃত ছাত্র বলতে যা বোঝায় জীবনের শেষ সচেতন মুহূর্তটি পর্যন্ত হরিনাথ তা ছিলেন। অপরিসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি গভীর অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন করে গিয়েছেন।

# দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

'দেশের স্বার্থে সঁপিয়া জীবন, হইলে দেশপ্রাণ।''

মেদিনীপুরের এক গ্রামের ছেলে। কলকাতায় রিপন কলেজের ( বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ) ছাত্র। কলেজ অধ্যাপক বিখ্যাত দেশ-নায়ক স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশী-মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ। কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক পড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ কম। সর্বক্ষণ দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী একং ভারতের উত্থান-পতনের ইতিহাস পাঠে তন্ময় হয়ে থাকেন। একবার পূজোর ছুটিতে বাড়ি গেলেন ছেলেটি। বাড়িতেও রাত জেগে পড়াশুনা করেন। একদিন মায়ের বিছানায় বসে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লেন। মা তো অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ মাঝ রাতে 'মা, মা' শব্দে চেঁচিয়ে উঠলেন। চীৎকারে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, কি হয়েছে খোকা, এই যে আমি। কিন্তু ছেলেটির 'মা, মা' চীৎকার আর বন্ধ হয় না। শেষে মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, 'মায়ের কোলে শুয়ে মা, মা বলে অমন চেঁচাচ্ছিস কেন' ? কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে ছেলেটি বললেন 'তোমাকে নয়, আমি অন্য মাকে ডাকছি।' মা বললেন, 'তোর অন্য মা-টি আবার কে ?' ছেলেটি বললেন, 'আমার বন্দিনী দেশ-মা।' ছেলেটি মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মা, আমি যদি এই বন্দিনী দেশ-মায়ের মুক্তির কাজে ব্রতী হই, তুমি আমায় বাধা দেবে না তো ? মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেন, 'বন্দিনী দেশ-মাকে উদ্ধার করার কাজে ব্রতী হবি এর চেয়ে গৌরবের, আনন্দের আর কি আছে তোর গর্ভধারিণী মায়ের। এই দেশ তো আমারও মা, আমাদের সকলের মা।' ছেলেটি আবেগে অধীর হয়ে মায়ের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। মা ছেলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

কে এই অসাধারণ দেশভক্ত কিশোর নিদ্রিত অবস্থায়ও যিনি পরাধীনা দেশমাতৃকার মুক্তির স্বপ্ন দেখেন।

ইনিই চির-উন্নতশির পুরুষ-সিংহ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যে মেদিনীপুর জেলা স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা তথা ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে দেশ-প্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই জেলাবাসীর জাগরণের নায়ক। তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা। মেদিনীপুর বলতে শাসমল এবং শাসমল বলতে মেদিনীপুরকেই বোঝায়। বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক ও ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে এবং তাঁর গায়ের রঙ ছিল মিশমিশে কালো। তাই ইংরেজরা তাঁকে বলত 'বাংলার কালো ষাঁড়' ( ব্ল্যাক বুল অব্ বেঙ্গল ); সংকল্পে, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতায় এবং সর্বোপরি স্বদেশ সেবায় বীরেন্দ্রনাথ বাংলার দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "জীবিতা-বস্থায় আমি যে-শির কখনোও কাহারও নিকট অবনত করি নাই, মৃত্যুর পরেও যেন আমার সেই শির অবনমিত করা না হয়। আমাকে যেন মৃত্যুর পর দণ্ডায়মান অবস্থায় দাহ করা হয়।" তাঁর সেই অন্তিম ইচ্ছা রক্ষা করা হয়েছিল তাঁকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দাহ করে—যা বিশ্বে অভূতপূর্ব।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার চণ্ডীভেটী গ্রামের জমিদার পরিবার শাসমলরা জনসেবা, দরাজ-হাতে দান ও গুণীজনদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ। এই পরিবারে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে ৯ কার্তিক শনিবার বীরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় জ্যেঠামশাই রামধন শাসমল বলেছিলেন— এই শিশু কালে একজন প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা ব্যক্তি হয়ে আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। বীরেন্দ্রনাথের পিতার নাম বিশ্বম্ভর শাসমল ও মাতা আনন্দময়ী। উভয়েই অত্যন্ত উন্নতমনা ও সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত তোৎলা ছিলেন। তাই কিছু দেরীতে তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ হয়। বাল্যকাল থেকেই বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুর্দান্ত ও একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিলেন। কোন কিছু করবেন স্থির করলে তা আর কিছুতে ত্যাগ করতে পারতেন না। ভয় কি জিনিস তা তিনি কখনো জানতেন না। তাই ভয় দেখিয়ে কোন কাজ থেকে তাঁকে বিরত করা মুশকিল ছিল। স্কুলে তিনি ছিলেন ছাত্রদের দলপতি। ছোটবেলা থেকেই

সকলের উপর নেতৃত্ব করবার একটা বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল। সবাই তাঁকে ভালবাসত এবং তাঁর কথা সযত্নে মেনে চলত।

দশ-এগার বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করে বীরেন্দ্রনাথ কাঁথি হাইস্কুলে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাধীন চিন্তার বিশেষ স্ফুরণ হয়। এই সময় বিখ্যাত বাগ্মী ও দেশ-নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সংবাদপত্র মারফত সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তিনি সযত্নে পাঠ করতেন। তিনি নিজে কবে দেশের কাজে যোগদান করে সুরেন্দ্রনাথের মতো বক্তৃতা দিয়ে দেশকে মাতিয়ে তুলবেন এই চিন্তায় সর্বক্ষণ বিভোর হয়ে থাকতেন।

ক্লাসের বিধিবদ্ধ লেখাপড়ায় বীরেন্দ্রনাথের বিশেষ মনোযোগ ছিল না। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক নানা বই তিনি নিজে ক্রয় করে পাঠ করতেন। সাহিত্যে তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। ইংরেজি ও বাংলা রচনায় তাঁর বেশ অভ্যাস ছিল। তিনি পদ্যও রচনা করতেন। তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতা তৎকালীন বিখ্যাত 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

ধনীর সন্তান হলেও বীরেন্দ্রনাথ সকল শ্রেণীর বালকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধু বৎসল। বন্ধুর বিপদ আপদে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। স্কুলে পড়ার সময় তিনি বহু গরীব ছাত্রের বই ও কাপড় কিনে দিয়েছেন, অর্থও দান করেছেন। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে খুব ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে নিজের বাড়িতে এবং সমুদ্র তীরবর্তী বাংলোয় বন্ধুদের নিয়ে বনভোজন করতেন। এতে তাঁর মা, বাবা ও দাদারা খুব খুশী হতেন।

ষোলো বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বীরেন্দ্রনাথ কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজে ( বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ ) এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। স্কুলে পড়ার সময় থেকে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর আদর্শ পুরুষ। যখন জানলেন যে সুরেন্দ্রনাথ রিপন্ কলেজে অধ্যাপনা করেন, তখন তিন মেট্রোপলিটান কলেজ ত্যাগ করে রিপণ কলেজে ভর্তি হলেন। উদ্দেশ্য সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে বক্তৃতা শোনা এবং নিজেকে স্বদেশ সেবার যোগ্য করে তোলা।

ছাত্রাবস্থাতেই বীরেন্দ্রনাথ দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

ঐ সময় তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি কলেজের ছাত্র, তখন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ তার অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হন এবং সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষ সাহায্য করেন। ঐ সম্মেলনে তিনি মেদিনীপুর জেলা থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐ বছরই কলকাতায় নিখিল ভাবত রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন বসে। ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ ঐ অধিবেশনেরও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হন এবং মেদিনীপুরের নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন।

কলেজে পড়তে পড়তে বিলেত যাওয়ার বাসনা বীরেন্দ্রনাথের মনে প্রবল হয়ে উঠে। তিনি ভাবলেন ভালভাবে দেশের কাজ করতে হলে ভাল আইন-জ্ঞান থাকা দরকার এবং সেজন্য বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে আসতে পারলে ভাল হয়। তাই এফ. এ. পরীক্ষা না দিয়েই বীরেন্দ্রনাথ বিলেত যাত্রা করলেন। মাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যাওয়ার আগে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে গেলেন যে বিলেতে অবস্থান-কালে তিনি অন্যায় ও অবৈধ কিছু করবেন না।

বিলেতে পৌঁছে বীরেন্দ্রনাথ 'মিডল-টেম্পল'-এ ভর্তি হলেন এবং তিন বছর আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যারিস্টারি পাস করলেন। বিলেতে থাকাকালে মায়ের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ব্যারিস্টারি পাস করার পর বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান ভ্রমণ করে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং দেশে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি ও দেশসেবার কাজে ব্রতী হন। এইখানেই তাঁর ছাত্রজীনের সমাপ্তি।

# পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

"বিরাট ভুবনমাঝে আজি
জলে তব বিরাট স্মৃতি।"

সাত-আট বছরের সুন্দর ফুট্‌ফুটে একটি ছেলে। তিনি সবেমাত্র ঘোড়ায় চড়া শিখেছেন। তাঁর বাবার ছিল একটি সাদা ধব্‌ধবে সুন্দর আরবী ঘোড়া। ঐ ঘোড়টির নাম ছিল রক্‌স। মাঝে মাঝে ছেলেটির খুব লোভ হত বাবার ঘোড়াটি নিয়ে একবার বাইরে বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু বাড়ির লোকজন ও চাকর-বাকরদের খুব কড়া নজর ছিল তাঁর উপর। বাইরে বেরোবার কোন উপায় ছিল না তাঁর। একদিন সুযোগ বুঝে ছেলেটি হঠাৎ আস্তাবলে চলে গেলেন। দেখলেন, ঘোড়াটি লাগামসুদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশপাশেও কেউ নেই। একটুও দেরী না করে ছেলেটি তখনই রক্‌স-এর পিঠে চেপে বসলেন এবং মনের আনন্দে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। রক্‌স খুব জোর কদমে ছুটতে লাগল। অত্যন্ত বেপরোয়া তার গতিবেগ। ক্ষুদে অপটু ঘোড়সওয়ার তার সঙ্গে পেরে উঠলেন না। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ধূলোয় গড়াগড়ি খেলেন। ঘোড়াটি খালি পিঠে বাড়ি ফিরে এল। এদিকে বাড়িতে তখন ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেছে। সওয়ার ছাড়া ঘোড়া যখন বাড়িতে একা ফিরছে তখন ছেলেটির নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে। বাড়ির একমাত্র ছেলে। বাবা মা কেউ স্থির থাকতে পারলেন না। বাবা চাকর-বাকর লোকজন নিয়ে তক্ষুণি ছেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। আর মা গভীর উৎকণ্ঠায় পথের পানে তাকিয়ে রইলেন। অনুসন্ধানকারী দলকে বেশীদূর যেতে হল না। বালক ধূলোমাখা গায়েই বাড়ি ফিরলেন। তাঁকে দেখে সবার মুখে হাসি ফুটল।

মা এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে আনন্দে কোলে তুলে নিলেন। বালক যেন কোন যুদ্ধ জয় করেই বাড়ি ফিরলেন।

সেদিনের সেই অসীম সাহসী বালকই পরবর্তী কালের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন তিনি। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ও রূপকার।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর জন্ম হয়েছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত এলাহাবাদ শহরে। পিতা ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং মাতা সহৃদয়া স্বরূপরানী। মতিলাল ছিলেন ভারতের অন্যতম সেরা উকিল। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন মরণ সংগ্রাম করে গেছেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগের প্রেরণা এবং রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা জওহরলাল পিতা মতিলালের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

ছোটবেলায় জওহরলাল মায়ের কোলে বসে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প শুনতে খুব ভালবাসতেন। মতিলাল বাড়িতেই পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্য প্রথমে একজন ইংরেজ মেমসাহেব নিযুক্ত করেছিলেন। পরে মিস্টার ব্রুক্স নামে এক অতি সুযোগ্য ইংরেজ শিক্ষককে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। জওহরলালের বাল্যশিক্ষা এঁরই পরিচালনায় শেষ হয়। মিস্টার ব্রুক্সের শিক্ষার গুণে বালক জওহরলালের মনে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইংরেজি লেখায় বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজিতে লেখা তাঁর "আত্মজীবনী," "ভারত আবিষ্কার," "বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশ্বের সেরা সাহিত্যের অন্যতম। আর বিজ্ঞান তো তাঁর চিরকালের অতি প্রিয় বিষয়। বহুদিন থেকে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষকে তিনি বিজ্ঞানের সাহায্যেই গড়ে তোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

ছাত্রজীবনে পুত্রের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মতিলাল বাড়িতে একটি ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার তৈরী করে দিয়েছিলেন। বালক জওহরলাল সেই গবেষণাগারে বসে নিজের হাতে বিজ্ঞানের নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করে প্রচুর আনন্দ পেতেন। বাড়িতে মতিলালের খুব বড় একটা লাইব্রেরি ছিল। তাতে নানা বিষয়ের খুব ভাল ভাল বই ছিল। জওহরলাল বহু বই পড়ে শেষ করেছিলেন। এক এক সময় পড়শোনায় তিনি এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, খাওয়া-দাওয়ার কথা প্রায়ই ভুলে যেতেন। তাঁর এ পড়ার অভ্যাস আজীবন ছিল। পরবর্তী জীবনে অজস্র কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও প্রত্যহ কিছুটা সময় পড়াশোনায় ব্যয় করতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যখন জেলে থাকতেন, তখন দিনরাত পড়াশোনা ও লেখা-লেখি করতেন। নানা কাজে দেশ-বিদেশের বহু স্থানে যখন তিনি গাড়ীতে অথবা বিমানে চড়ে যেতেন, তখনো তিনি ভ্রমণ-পথ বই পড়ে কাটাতেন। ছাত্রজীবন থেকে এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে প্রতিদিন কিছুটা সময় না পড়লে তাঁর ভাল লাগত না।

বাড়িতে বাল্যশিক্ষা শেষ হলে মতিলাল ছেলেকে বিলেতের সেরা বিদ্যালয় হ্যারো স্কুলে ভর্তি করালেন উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য। শুধু ক্লাসের পড়ার মধ্যেই জওহরলালের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বাইরের বহু বই পড়ে নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতেন। বিলেতে ইংরেজ সহপাঠীদের চেয়েও তাঁর সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ছিল অনেক বেশী। হ্যারো স্কুলে অধ্যয়নকালে একবার ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন হয়। স্কুলের এক শিক্ষক ঐ নির্বাচন সম্বন্ধে ক্লাসে একটি রচনা লিখতে দেন। স্কুলের

সমস্ত ছাত্রের মধ্যে একমাত্র জওহরলাল ব্রিটিশ নির্বাচন সম্পর্কে পুরোপুরি সব খবর দিয়ে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। শিক্ষকমশাই তাঁর প্রবন্ধের খুব প্রশংসা করেন।

হ্যারোতে পড়াশোনায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য জওহরলাল একবার কিছু বই পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল ইতালীর বিখ্যাত বীর গ্যারিবল্ডীর একখানি জীবন-চরিত। ঐ বইটি থেকে জওহরলাল তাঁর ছাত্রজীবনে দেশপ্রেমের বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন। গ্যারিবল্ডী যেভাবে ইতালীকে বিদেশীর হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন, ছাত্র জওহরলালও তখন পরাধীন ভারতবর্ষকে সেইভাবে স্বাধীন করবার বিষয় কল্পনা করতেন।

দু-বছরের মধ্যে হ্যারোতে পড়া শেষ করে জওহরলাল কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর পড়ার বিষয় ছিল রসায়ন, ভূ-তত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব। কেম্‌ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের একটি সমিতি ছিল। নাম ছিল 'ভারতীয় মজলিস'। সেখানে নানা রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হত। মজলিসে বক্তৃতা দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। না দিলে জরিমানা দিতে হত। যে জওহরলাল পরবর্তীকালে বিরাট জনসমাবেশে অনর্গল ভাষণ দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় করে রাখতেন, সেদিন কেম্‌ব্রিজের ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুখচোরা—প্রকাশ্য সভায় কথা বলতেই ভয় পেতেন। ঐ সময় বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি বিখ্যাত দেশ-নায়করা ভারতে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন। জওহরলাল গভীর আগ্রহের সঙ্গে এইসব খবর সংগ্রহ করতেন।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে জওহরলাল কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হন। বিজ্ঞানে তিনি "ট্রাইপস্" পেয়েছিলেন। তিনটি বিষয়ে অনার্স উপাধি পাওয়াকে ট্রাইপস্ বলে। এই উপাধি পাওয়া অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। ডিগ্রি লাভের পর জওহরলাল আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তারপর ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসেন। এইখানেই তাঁর গৌরবময় ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি।

# নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।"

কটক র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলের একটি ছাত্র। স্কুলে পড়তে পড়তেই তাঁর মধ্যে স্বদেশীভাব জাগতে শুরু করল। তিনি প্রথমে সাহেবী পোশাক কোট, প্যান্ট পরে স্কুলে যেতেন। কিন্তু কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলেন যে তিনি ছাড়া আর সব ছাত্র ও শিক্ষকমশাইরা ধুতি জামা পরে স্কুলে আসেন তখন তিনি বুঝলেন যে ধুতি জামাই এদেশের জাতীয় পোশাক। তারপর তিনি কোট প্যান্ট ছেড়ে ধুতি জামা পরতে শুরু করলেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দান করেছেন, সেই সব বিপ্লবীদের প্রতি ছাত্রটির বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যেত। খবরের কাগজ থেকে বিপ্লবীদের ছবি কেটে তিনি তাঁর পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখতেন। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসির দ্বিতীয় বার্ষিক দিবসে তিনি স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের কাছে প্রস্তাব করলেন যে ঐ দিনটি তাঁরা উপোস করে কাটাবেন। সমস্ত ছাত্র তাঁর প্রস্তাব মেনে নিল। তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রেরা ঐ পুণ্য দিনটি না খেয়ে কাটাল. প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস খুব খুশী হলেন। কারণ, তিনিই ছাত্রটিকে দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁকে ইংরেজের বিষ নজরে পড়তে হল। তাঁকে কটক থেকে কৃষ্ণনগরে বদলী কর হল।

এই প্রধান শিক্ষকমশাইকে ছাত্রটি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাই বিদায়ের সময় তিনি কান্নায় ফেটে পড়লেন। প্রধান শিক্ষকমশাইও বিচলিত হলেন। তিনি ছেলেটিকে বললেন—আবার দেখা হবে। ছেলেটি তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে পায়ের ধূলো মাথায় ঠেকালেন। প্রধান শিক্ষকমশাই তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি যেন একজন মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পার, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

প্রধান শিক্ষকমশাই-এর এই আশীর্বাদ ও প্রার্থনা ছাত্রটির জীবনে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল। তিনি পরে সত্যই একজন 'মানুষের মতো মানুষ'—বিরাট

মানুষ হয়েছিলেন। ইনিই আমাদের সকলের অতি প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয়, দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বহু দুঃখ-কষ্ট বরণ করে ভারতের বাইরে গিয়ে ইনি 'আজাদ-হিন্দ্ সেনা বাহিনী' গঠন করেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভে তাঁর দান অপরিসীম।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় উড়িষ্যার কটক শহরে, ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু কটকের উকিল ছিলেন। এঁদের আদি নিবাস কলকাতার দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা জেলার মহিনগর গ্রামে। সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী ছিলেন কলকাতার হাটখোলা পল্লীর দত্ত পরিবারের মেয়ে। মা-বাবা উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির। সুভাষচন্দ্র মা-বাবাকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করতেন। তাঁরাও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আদর করে ডাকতেন 'সুবি'। সুভাষচন্দ্রেরা ভাই বোন করে চোদ্দ জন।

পাঁচ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্রকে কটকের একটি মিশনারী স্কুলে ভর্তি করা হয়। এখানে শিক্ষকরা ছিলেন সব সাহেব। তাই তিনি ইংরেজি খুব ভাল শিখেছিলেন। আর শিখেছিলেন ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা ও পরিচ্ছন্নতা। এই সব গুণ তাঁর ছাত্রজীবনের ভিত শক্ত করেছিল।

বার বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র কটক র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এর আগে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত কিছুই জানতেন না। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি এমন উন্নতি করলেন যে বাৎসরিক পরীক্ষায় বাংলায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে ক্লাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁর প্রতিভা দেখে শিক্ষকরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে দু-বছরের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। মাত্র দু-নম্বরের জন্য প্রথম হতে পারেননি। আগেই বলা হয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাশ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তিনি ছিলেন স্নেহপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক ও চরিত্রবান্ পুরুষ। সুভাষচন্দ্র এঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এঁর নিকটই সুভাষচন্দ্র দেশকে ভালবাসতে শিখেন।

ছোটবেলা থেকেই সুভাষচন্দ্র আদর্শ জীবন গঠন করে পৃথিবীতে কোন

কিছু একটা বড় কাজ করার কথা চিন্তা করতেন। তারপর বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে তিনি বিরাট প্রেরণা লাভ করলেন এবং জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করে ফেললেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন "বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ।"

এই সময় সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে তিনটি মহান্ আদর্শ প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথম ও প্রধান আদর্শ হল লেখাপড়া করে জ্ঞানার্জন করা। দ্বিতীয় হল ধর্মচর্চা-ধ্যান-ধারণার দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা। আর তৃতীয় আদর্শ হল দশ ও দেশের সেবা করা—দরিদ্র দেশবাসীর দুঃখ দূর করা এবং পরাধীন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর সুভাষচন্দ্র কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তিনি নানা জনহিতকর কাজ করতেন এবং বিপ্লবীদের আড্ডায় যেতেন। বন্যা বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে পীড়িতদের জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন। তাছাড়া, প্রতি রবিবার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে চাল, ডাল ও অর্থ সংগ্রহ করতেন তা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হত।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় সুভাষচন্দ্রের মনে ধর্ম-জিজ্ঞাসা খুব প্রবল হয়ে ওঠে। ঐ বছর গরমের ছুটিতে বাড়ির কাউকে কিছু না বলে পশ্চিমে পাড়ি দেন গুরুর সন্ধানে। কিন্তু মনের মতো গুরু না পাওয়ায় নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। দু-বছরে পড়াশোনা বিশেষ কিছু হয় নি। তবুও আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে সুভাষচন্দ্র প্রথম বিভাগে পাস করেন। তারপর দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে ঐ প্রেসিডেন্সি কলেজেরই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন ওটেন নামে এক ইংরেজ সাহেব। একদিন তিনি ক্লাসে বক্তৃতা দিতে দিতে বলে ফেললেন—'ভারতবাসীরা বর্বর'। এতে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলেজে ধর্মঘট হল। সুভাষচন্দ্র ওটেন সাহেবকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করালেন। এতেও ওটেন সাহেবের শিক্ষা না হওয়ায় সুভাষচন্দ্র তাঁকে আরও শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু উদ্ধত ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করল।

বিতাড়িত হয়ে সুভাষচন্দ্র কটকে চলে গেলেন এবং জনসেবার কাজ শুরু করলেন। সহপাঠী ও বন্ধুদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজনকে বেছে নিয়ে একটি দল গঠন করলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। আর নানা প্রকার সমাজ-সেবার কাজে তাদের নিয়োজিত করলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর দলকে নিয়ে নানা স্বদেশী গান গাইতে গাইতে প্রত্যেক দিন ভোরে কটক শহরের রাস্তায় প্যারেড করে বেড়াতেন। কটকের বহু ছাত্র সুভাষচন্দ্রের আদর্শে দেশের কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরে এসে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। এই সময় তিনি 'ভারতরক্ষা বাহিনী'র 'ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোর'-এ ভর্তি হন। সামরিক শিক্ষার সময় তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে শিবির-জীবন যাপন করতেন। বন্দুক চালনা, কুচকাওয়াজ প্রভৃতি সৈনিক-শিক্ষার সব কিছুতেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই শিক্ষার বলেই পরবর্তীকালে একদিন তিনি ভারতের বাইরে গিয়ে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন করে ইংরেজের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তৃতীয় বছর সুভাষচন্দ্রের পড়াশোনা কিছুই হয় নি। চতুর্থ বছর খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং দর্শনশাস্ত্রের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পাস করেন। এর পর তিনি বিলেতে গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। কিন্তু দেশের কাজ করার জন্য তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন নি। স্বদেশে ফিরে এসে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করেন। সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের কামনা ও সাধনা সার্থক হয়ে ওঠে।

# বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

"মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।"

অত্যন্ত বুদ্ধিমান বালক, কিন্তু বড়ই গরীব। বার বার স্কুলে ভর্তি হয়, কিন্তু অভাবের তাড়নায় বার বারই তাকে স্কুল ছাড়তে হয়। একবার এমন হল যে তাকে স্কুল ত্যাগ করে আসানসোল স্টেশনে একটি রুটির দোকানে 'বয়ে'র কাজ নিতে হল। খাওয়া থাকা ছাড়া মাসিক বেতন পাঁচ টাকা।

ছোটবেলা থেকেই ছেলেটির গরীবের প্রতি বড় দয়া। রুটির দোকানে যখন সে কাজ করত, তখন ভিক্ষাপাত্র-হাতে এক ভিখিরী রোজ এসে দোকানের সামনে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। ছেলেটি নিজের অংশ থেকে রুটির টুকরো, ভাত বা দু-একটা পয়সা তাকে দিত। একদিন দেখা গেল ভিখিরীটি পথের মাঝে মরে পড়ে আছে। খবর পেয়ে ছেলেটি কান্নায় আকুল হয়ে সেখানে ছুটে গেল এবং চাঁদা তুলে তার সৎকার করল। সেদিন ছেলেটি সারাদিন কিছুই খায়নি। বেদনাভরা মনে চুপচাপ বসেছিল। পরে সন্ধ্যাবেলায় ঐ মৃত ভিখিরীর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখল। তার কিয়দংশ এইরূপ—

বুকের বেদনা বুকেতে রাখিলে ঢাকি
মরণের দিনে সেই বুকে হাত রাখি
দেখাইয়া গেলে ঐ স্থানে আছে লেখা—
ব্যথার কাহিনী যাহা যায় নাকো দেখা।

কে এই দরিদ্র-দরদী বালক, যার মধ্যে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ? ইনিই আমাদের চির-প্রিয়, চির-বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইনি অজস্র স্বদেশী গান ও কবিতা লিখে

দেশবাসীকে জাগিয়েছিলেন। সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইনি বহু কবিতা লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে এঁর বিরাট অবদান।

বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরবর্তী আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের জন্ম হয়। এঁর পিতা ফকির আহমদ ছিলেন ধর্মপ্রাণ, উদার-হৃদয়, ন্যায়পরায়ণ মুসলমান। তাঁর নির্মল চরিত্রের জন্য হিন্দু-মসলমান সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। মাতা জাহেদা খাতুন ছিলেন উচ্চ পরিবারের মেয়ে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। বড় দুঃখে পিতামাতার দিন কাটত। এতো দুঃখের মধ্যে যে শিশুর জন্ম হল, ক-দিন পরে তার নাম রাখা হল 'দুখুমিয়া'। অবশ্য পোশাকী নামকরণ হয়েছিল নজরুল ইসলাম। একটু বড় হতেই ফুট্‌ফুটে সুন্দর শিশুকে মা ডাকতেন 'নজর আলী' বলে। পাড়া-পড়শীরা তার পাগলাটে স্বভাব আর ফকির ও সাধুসন্তদের প্রতি অনুরাগ দেখে 'তারা-ক্ষ্যাপা' বলে ডাকত। আবার কেউ কেউ বলত 'ক্ষ্যাপা শিবঠাকুর'। আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাঁর 'নুরু' বলেও একটা ডাক নাম ছিল। এই নামটি নজরুলের বড় প্রিয় ছিল।

নজরুলের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় বাড়িতে পিতার কাছে। আট বছর বয়সে হঠাৎ পিতার মৃত্যু হলে, তিনি গ্রামের মক্তবে ভর্তি হন। এই সময় বড় দুঃখের মধ্যে তাঁদের দিন কাটত। বালক নজরুল খুব সুন্দর কোরান পাঠ করতে পারতেন। দেখতেও ছিলেন বড় সুন্দর। নানা স্থানে কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যা করে এবং মোল্লাগিরি করে কিছু কিছু আয় করতেন। এই সময় তাঁর মধ্যে ধর্মভাব দেখা দেয়। এজন্য তিনি কেবল ইসলাম শাস্ত্রই পড়তেন না, হিন্দু শাস্ত্রও পাঠ করতেন। বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়ে শেষ করেন। দশ বছর বয়সে নজরুল মক্তবের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ মক্তবেই শিক্ষকতার কাজ করেন।

গান ছিল বালক নজরুলের প্রাণ। কোথাও গান হবে শুনতে পেলে অমনি ছুটতেন। এই অতি অল্প বয়সেই তিনি কিছু কিছু গান ও কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় ঐ অঞ্চলে 'লেটো'র গান ও কবিগানের প্রচলন ছিল। এগার বছর বয়সে বালক নজরুল ঐ 'লেটো' গানের দলে যোগ দিলেন। দলের ওস্তাদ্ চাকরা গোদা তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়ে ভবিষ্যৎ

বাণী করলেন,—'আমার ব্যাঙাচি বড় হলে সাপ হবে।' বালক নজরুল দলের জন্য নাটক, প্রহসন ও গান লিখতেন। গানে সুর দিতেন এবং গান শেখাতেন। তরুণ অভিনেতার দল তাঁকে 'ছোট ওস্তাদ্' বলে ডাকত। শেষে তিনি একটি দলের ওস্তাদ হয়ে গেলেন। তখনই লোকের কাছে পেলেন 'কবি' আখ্যা। তিনি 'চাষীর সং', 'ঠগপুরের সং,' 'শকুনিবধ', 'মেঘনাদবধ', 'রাজপুত্র', 'কালিদাস', 'দাতাকর্ণ', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা করলেন। বালক-কবি হলেও তিনি কিন্তু 'লেটো'র গানে নতুন প্রাণের সঞ্চার করলেন। তাঁর রচিত 'লেটো'র একখানা বন্দনা গান—

> "সকল পীর আর দেবতা কুলে, সকল গুরুর চরণমূলে
> জানাই সালাম হস্ত তুলে,
> দোওয়া কর তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ উজ্জালা।"

'লেটো'র দলে এসে বালক নজরুল অসংখ্য গান, নাটক, প্রহসন লিখলেন। সেই অতি অল্প বয়সেই অতি দ্রুত কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিপক্ষ দলকে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মিশ্রিত গানে আক্রমণ করে জর্জরিত করতেন। অনেক সময় তাঁর গান আরবী-ফারসী-উর্দু-ইংরেজি মিশ্রিত হত। বিপক্ষের ছড়াদার ও পাল্লাদারকে লক্ষ্য করে লেখা নজরুলের একটি ব্যঙ্গগীতি বড়ই সুন্দর—

> "ওহে ছড়াদার ওহে ছাট পাল্লাদার. মস্ত বড় ম্যাড ;
> চেহারাটাও মানকি লাইক, দেখতে ভেরী ক্যাড
> মান্‌কি লড়বে বাবরকা সাথ্, ইয়ে বড়া তাজ্জব বাত
> জানে না ও ছোট্ট হলেও, হাম্ ভি লায়ন ল্যাড।
> শুন ও ভাই ব্রাদার দোহারগণ,
> মচ্ছড় ছানারা সব করিয়াছে পণ
> গান গাহিবে আসর মাঝে, খবর বড় স্যাড।"

তাঁর রচিত একটি 'চাপান' গান—

> "পাল্লা সাথে 'লেটো'র ল্যাঠা লাগলো,
> ছড়াদার ও দোঁহাররা সব ভাগলো।"

নজরুল তাঁর কৈশোরে ছিলেন ঘর-পালানো ছেলে। যেখানে যাত্রা

গান, নাটক, কথকতা, সেখানেই নজরুল। পড়াশোনা ছেড়ে 'লেটো'র দলে ভিড়ায় সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন পরে নজরুল নিজেও বেশ বিরক্তবোধ করেন। লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা তাঁর কম ছিল না; কিন্তু বাড়ির আর্থিক দুরবস্থার জন্য মনস্থির করতে পারতেন না।

অবশেষে এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের সহায়তায় নজরুল রানীগঞ্জের সিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু অল্প দিন পরে তাঁকে এ-স্কুল ছাড়তে হল। তারপর অপর এক আত্মীয়ের চেষ্টায় মাথরুন স্কুলে ভর্তি হলেন। তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। নজরুলের আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় কুমুদরঞ্জন তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি ক্লাস পরিদর্শনে এলে নজরুল তাঁকে প্রণাম করতেন। আর কুমুদরঞ্জন তাঁকে আদর করতেন।

মাথরুন হাইস্কুলে নজরুল যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এখানে অতি অল্প দিনেই তিনি সকলের সুপরিচিত হন। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্লাসের পড়াশোনা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর আগ্রহ দেখে শিক্ষকরা তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ওইটুকু ছেলের জ্ঞানের পরিধি ও জানবার আগ্রহ দেখে তাঁরা অবাক হতেন। কিন্তু চির-চঞ্চল নজরুল এক বছর পরে স্কুল ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ির দৈন্যদশা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আসানসোল স্টেশনে এক রুটির দোকানে 'বয়ে'র কাজ নেন। সামান্য বেতন, খাটুনি বেশী। কাজের ফাঁকে পড়াশোনা ও গানবাজনা করতেন। তখন তাঁর বয়স তের বছর।

আসানসোলের দারোগা রফিজউদ্দিন সাহেব নজরুলের সুন্দর চেহারা ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে বিশেষ মুগ্ধ হন। তাঁর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলায়। একদিন বালক নজরুলকে তাঁর দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দরিরামপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। এখানেও দেখা গেল তাঁর সেই চির-অশান্ত ও অস্থির আচরণ। বাৎসরিক পরীক্ষার পর নজরুল দেশে ফিরে এলেন এবং কিছুদিন 'লেটো'র দলে কাটিয়ে আবার রানীগঞ্জের সিয়ারসোল হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এখানে ছাত্র-শিক্ষক সবারই খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এবার নজরুল পড়াশোনায় খুব মন দিলেন। ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার

করলেন। সবশেষে বাৎসরিক পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন পেয়ে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি কেবল ক্লাসের পড়াই পড়তেন না, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক সব গ্রন্থ পাঠ করতেন। এই সময় কিছু কিছু ইংরেজি বইও পড়তেন। আর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তখন থেকে তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড রবীন্দ্র-অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। শোনা যায় একদিন খেলার মাঠে এক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরূপ সমালোচনা করায় নজরুল ক্ষেপে গিয়ে বার-পোস্ট তুলে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন।

সিয়ারসোলের ছাত্রজীবনে রানীগঞ্জের আর এক ছাত্র পরবর্তীকালের প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুলের আলাপ হয় এবং সাহিত্য-আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ইংরেজি ১৯১৭ সাল। নজরুল তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। কয়েক দিন পরেই তাঁর প্রি-টেস্ট পরীক্ষা আরম্ভ হবে। এই সময় ইউরোপে চলছিল প্রথম মহাযুদ্ধ। নজরুল পড়া ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য বাঙালী পল্টনে যোগ দিলেন এবং করাচীর সেনানিবাসে ট্রেনিং নিতে লাগলেন। এই সেনানিবাসে তাঁর তিন বছর কাটে। পরিশেষে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি হাবিলদার পদে উন্নীত হন।

সৈনিক জীবনের কঠোর কর্তব্যের মধ্যেও তাঁর জ্ঞানচর্চা ও কাব্যচর্চা থেমে যায় নি। অবসর সময়ে তিনি কবিতা, গান ও গল্প লিখতেন এবং কলকাতার বিভিন্ন কাগজে পাঠাতেন। ঐসব রচনার কিছু কিছু ছাপাও হত। পল্টনে সাহিত্য-রসিক এক পাঞ্জাবী মৌলভী ছিলেন। তিনি ছিলেন ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। নজরুল তাঁর কাছে পারশী কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলেন। এইভাবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব নিবিড় হয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পল্টন ভেঙে দেওয়া হল। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন হলেন। তখন তিনি মাত্র বিশ বছরের যুবক।

# কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

"আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ।"

ছেলেটির বয়স ন-দশ বছর মাত্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। ছড়া পড়া ও ছড়া লেখায় তাঁর দারুণ অনুরাগ। ঐ শিশু বয়সেই তিনি বেশ কিছু ছড়া রচনা করেছেন। এজন্য তাঁকে বিশেষ একটা মাথা ঘামাতে হয় না। ভাব, ভাষা ও ছন্দ তাঁর বেশ সহজেই এসে যায়। আর তিনি ঘন ঘন খাতার পাতা ভরে তোলেন। এ যেন ঐ শিশুর কাছে বেশ এক মজার খেলা। যেমন

"রমা রানী তুই বোন পরীর মতন,
সবে বলে মেয়ে তুটি লক্ষ্মী কেমন।" বা
"রাম বড়ো ভালো ছেলে পাঠশালা যায়
শ্যাম শুধু ঘরে বসে তুধ ভাত খায়।"

ছড়া লিখে শিশু কবি পরিবারের সকলের কাছে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেন। ক্ষুদে কবিকে নিয়ে বাড়িতে বেশ হৈ হৈ চলতে থাকল। কবির জ্যেঠামশায় ছিলেন সুপণ্ডিত ও সাহিত্যানুরাগী। শিশুর অসাধারণ কবি-প্রতিভা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বললেন—"এর মধ্যে ভবিষ্যতে বিরাট এক সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে।"

এই বিস্ময়কর শিশু কবিই পরবর্তীকালের বিখ্যাত কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। যাঁর 'রানার' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে আমরা সবাই সুপরিচিত। অত্যন্ত তুঃখের বিষয়, যে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে সুকান্ত পৃথিবীতে এসেছিলেন, তার অতি সামান্যই তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। কারণ, কৈশোরেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটল। তবুও তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যে দেশকে যা দিয়ে গেছেন, তা মনীষীদেরও বিস্ময়। কিশোর হলেও যে সুমহান চিন্তা ও মানবতাবোধ তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তা একমাত্র মনীষীদের মধ্যেই দেখা যায়। তাই তিনি কেবল কিশোর কবি নন, কিশোর মনীষীও।

সুকান্তর জন্ম হয় বাংলা ১৩৩৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে মাতামহ গৃহে। পিতৃ-নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের মাদারীপুরে। পিতা নিবারণচন্দ্রের ছিল শিল্প ও সাহিত্যপ্রীতি। তিনি নিজের চেষ্টায় কলকাতায় 'সারস্বত লাইব্রেরি' নামে একটি পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যা আজও বর্তমান। মাতার নাম সুনীতি দেবী।

শিশুকালে সুকান্ত বইয়ের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকেন। ঐ সময় বহু ছড়ার বই তিনি পড়ে শেষ করেন। তাছাড়া, মায়ের কাছে মাঝে মাঝে রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য পাঠ শুনতেন।

যথাসময়ে সুকান্তকে বেলেঘাটার এক প্রাথমিক বিদ্যালয় 'কমলা বিদ্যামন্দিরে' ভর্তি করে দেওয়া হয়। এখানে তিনি খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করতেন। বেশ ভাল ও মেধাবী ছাত্র বলে তিনি শিক্ষকদের স্নেহভাজন হন।

চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার সময় সহপাঠীদের নিয়ে সুকান্ত একটি হাতেলেখা পত্রিকা বার করলেন। নাম দিলেন 'সঞ্চয়'। এতে তিনি একটি হাসির গল্প লিখেছিলেন। ঐ সময় 'শিখা' নামে একটি শিশু পত্রিকা প্রকাশিত হত। তাতে বালক সুকান্তর লেখা গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতি ছাপা হত।

দশ-এগারো বছর বয়সে তিনি রচনা করলেন 'রাখাল ছেলে' নামক একটি রূপক গীতিচিত্র। সেটি বালক কবির এক অপূর্ব সৃষ্টি। ঐ সময় তিনি 'মধুমালতী' ও 'সূর্য-প্রণাম' নামক আরোও দুটি গীতিচিত্র রচনা করেছিলেন। 'সূর্য-প্রণাম' লেখা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে অবলম্বন করে।

সুকান্ত যখন বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি ক্লাসের ছেলেদের ছবি ও লেখা নিয়ে হাতেলেখা একটি পত্রিকা বার করেন—নাম দেন 'সপ্তমিকা'। ঐ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাঁর সাহিত্য-সাধনায় বিশেষ উৎসাহ দান করতেন।

ছাত্রজীবনে সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবার কিছু কিছু কাজেও তিনি হাত দিয়েছিলেন। যেমন, পাড়ার কয়েকজন বন্ধু মিলে ছোট ছোট ছেলেদের পড়াবার জন্য একটি কোচিং ক্লাস খুলেছিলেন।

বর্তমানে বেলেঘাটার 'স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিশোর সুকান্ত।

সুকান্তর সত্যিকারের কবিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, যখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছর। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিভীষিকায় বিভ্রান্ত জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে 'জাগবার দিন আজ' কবিতায় সুকান্ত লিখলেন:

"পণ কর দৈত্যের অঙ্গে, হানবো বজ্রাঘাত মিলবো সবাই একসঙ্গে।
সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির, দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।
আজকে শপথ কর সকলে, বাঁচাবো আমার দেশ যাবে না তা শত্রুর দখলে।

পরাধীন দেশে জন্ম হলে মানুষকে যে কত অপমান ও নির্যাতন ভোগ করতে হয় তার বর্ণনায় সুকান্ত লিখলেন:

"এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম তোমাকে সেলাম।"

কেবল সর্বগ্রাসী যুদ্ধ নয়: ঝড়, বন্যা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে জনগণের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে মারা যেতে লাগল। অথচ অঢেল খাদ্য-শস্য তখন ধনীর ঘরে মজুত রয়েছে। অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে কিশোর কবি সুকান্ত লিখলেন:

"আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্ট নীড় নগরে ও গ্রামে।"...

তারপর ধনী মজুতদারদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন:

"শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব দিবি কি তার?...
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।"

এই সময় সুকান্ত "কিশোর বাহিনী" নামে কিশোরদের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সারা বাংলায় গঠিত তিনশো কিশোর বাহিনীতে প্রায় ত্রিশ হাজার ছেলেমেয়ে সংগঠিত হয়েছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা ও স্বাধীনতার আদর্শে এদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন কিশোর সুকান্ত। ঐ

সময় দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'কিশোর সভা' নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। সুকান্ত ছিলেন তার সম্পাদক। 'কিশোর সভা'য় প্রকাশিত 'মিঠে কড়া'র ছড়াগুলি ছিল তাঁরই রচিত। কিশোর বাহিনীর ছেলে-মেয়েদের অভিনয়ের জন্য তিনি 'অভিযান' নামে একটি রূপক কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন।

কিশোর কবি সুকান্ত কোন শখের কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন শোষিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জনগণের কবি। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ, শাসন-পীড়ন-শোষণ সহনের কাহিনী তাঁর লেখনী-মুখে কবিতাকারে তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। কেবল কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হন নি। কৃষক, শ্রমিকের সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছেন। তাদের মিছিলের পুরোভাগে থেকে সংগ্রাম করেছেন। সংগ্রাম ও সংগঠনের কাজে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অর্ধাহারে অনাহারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তিনি অচিরে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলেন। শয্যা নিলেন যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে। বহু চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। বাংলা ১৩৫৪ সালের ২৯শে বৈশাখ মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন তিনি ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর ছাত্রজীবন আর শেষ হল না; কিন্তু মানব জীবন শেষ হয়ে গেল। তবে তিনি চির অমর হয়ে রইলেন অল্প হলেও তাঁর অসামান্য সাহিত্য কর্মের মধ্যে।

# ছাত্রদের প্রতি মনীষীদের বাণী

# ছাত্রদের প্রতি শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে সকলে তোমায় ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না। তুমি কখনও আলস্য করিও না।

নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

অবোধ বালকেরা সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখাপড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চিরকাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।

শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।

যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্য দিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না; অধিক দিন মনে থাকিবে না; পড়া বলিবার সময় ভাল বলিতে পারিবে না।

সদা সত্য কথা বলিবে। যে সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না।

পিতামাতাই জীবন্ত দেবতা। যাঁহাদের দুঃখ-কষ্টে লালিত পালিত, যাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসায় আমরা জীবিত, সেই পিতামাতাই পরম দেবতা। তাঁহাদের বাদ দিয়া অন্য দেবতার পূজায় ধর্ম হয় না। কদাচ পিতামাতার অবাধ্য হইও না।

কখনো লোকের দুঃখ নিবারণে বিমুখ হইবে না। লোকের উপকার করিয়া কখনও কিছু প্রত্যাশা করিবে না, প্রশংসার আশা করিবে না, নিঃস্বার্থভাবে পরার্থে নিজেকে বিলাইয়া দিবে।

যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরমধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম। তুমিও স্বদেশের হিতসাধনে সচেষ্ট হইবে।

# ছাত্রদের প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে; তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়; দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে।

আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে, ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে।···তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মান হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে, কথা থেকে, কাজ থেকে দূর করে দেবে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না, প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমনকি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না।

'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে লাভ করতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা 'আমি সব পারব'।

গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীর পবিত্র রাখবে—কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে।···তোমরা সত্যব্রত পালন করবে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে।···সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে।···তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভাল করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি। যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয়, তবে ঐ দুটি পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না।

# ছাত্রদের প্রতি বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ

প্রত্যেকের জীবনে একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। আদর্শহীন জীবন কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায়। ছাত্রজীবন থেকেই একটি বিশেষ আদর্শ গ্রহণ করে তাকে সারা জীবন অনুসরণ করে চলতে হবে। এতে চরিত্র সুগঠিত হবে এবং ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম থাকবে।

দেহটাকে আগে গড়ে তোল্। তবে তো মনের ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। এখন বীর্যবান হবার চেষ্টা কর! তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লৌহের মতো পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু, যাহারা দৃঢ় এবং শক্তিশালী, জগৎ তাহাদেরই প্রতি সহানুভূতিশীল।

আমাদিগকে 'অভীঃ'—নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ—জাগো, কারণ, তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকদের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—উঠো, জাগো, যতদিন না অভিপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত সেই উদ্দেশ্যে চলিতে থাকো।

পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর।

সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও। তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বিধান করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি অপরের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে না পার?

জ্ঞানলাভ করিবার আমাদের একটি মাত্র উপায় আছে—একাগ্রতাই এই উপায়। এই একাগ্রতা যত অধিক হইবে, মানুষ তত অধিক জ্ঞানলাভ করিবে।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

একটি ভাব আশ্রয় কর, উহার জন্য জীবন উৎসর্গ কর এবং ধৈর্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যাও; তোমার জীবনে সূর্যোদয় হইবেই।

বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

## ছাত্রদের প্রতি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী

ছাত্রদের জাতি গঠনকারী হতে হবে।...আমি চাই যে তোমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে বিশ্বের সামনে নিজ বিশ্বাসের বলে অকম্পিত পদে দাঁড়াও।

তোমাদের সব পাণ্ডিত্য বৃথা, যদি না পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন কর এবং নিজচিন্তা ও কর্মের প্রভু হও।

তোমাদের ভাগ্য তোমাদেরই হাতে। যে কোন রকম বিপদ দেখা দিক না কেন, নির্ভয়ে তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।...যে ছেলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পবিত্রতা পালন না করে, সে যে-কোন শিক্ষায়তন থেকে বিতাড়িত হবার উপযুক্ত। যে কোন বালক সর্বদা মনকে পবিত্র রাখবে। সবল চরিত্র গড়ে তুলতে না পারলে শুধু শিক্ষার কোন মূল্য নাই

ভারতীয় ছাত্ররা শুধু ভারতের কেন, সারা বিশ্বের আশাস্থল। দলগত রাজনীতিতে ছাত্ররা কোনক্রমেই অংশ গ্রহণ করবে না। তারা হচ্ছে বিদ্যার্থী এবং তথ্যান্বেষক—রাজনীতিবিদ নয়। ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে দেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা। লেখাপড়া শেষ হলে তবে কাজের সময় আসে।

তারা ত্যাগের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হবে।...প্রতিবেশীর পরিচর্যা অবশ্যই তারা করবে। গ্রামে তারা সাফাই এবং আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করবে এবং গ্রামের শিশু ও বয়স্কদের তারা শিক্ষা দেবে।

কোন কিছুই তারা গোপন করবে না। তাদের যাবতীয় আচরণ খোলাখুলি হবে। তারা আত্মসংযমমূলক পবিত্র জীবনযাপন করবে,সমস্ত ভয় বিসর্জন দেবে এবং সহপাঠী দুর্বল ছাত্রদের রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ কর।

প্রত্যেক বিদ্যার্থীর সত্য, অহিংসা বা প্রেম, ব্রহ্মচর্য, অস্বাদ, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, শরীরশ্রম, স্বদেশী, নির্ভীকতা, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও সহনশীলতা প্রভৃতি একাদশ ব্রতপালন অবশ্য কর্তব্য। এই সব ব্রত পালনে চরিত্র সুগঠিত হবে। নিজের এবং বিশ্বমানবের কল্যাণ এই সব ব্রত পালনের মধ্যে নিহিত।

## ছাত্রদের প্রতি মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ

তোমরা লেখাপড়া শিখবে দেশের জন্য। দেশের জন্যই তোমরা তোমাদের দেহ, মন গঠন করবে। তোমরা অর্থ উপার্জন করবে দেশ সেবার জন্য দেহ-ধারণ করতে। তোমরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাবে যাতে উন্নত জ্ঞান আহরণ করে দেশের উন্নতি করতে পার। সর্বদা এমন কাজ করবে যাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তোমার সকল কর্মের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হবে দেশের কল্যাণ।

আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিকতা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ এক নতুন ভারত গড়া। তোমরাই তো সেই ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।

কিশোর ভারতের প্রতিই আমাদের আহ্বান। কিশোর-কিশোরীরাই হবে নতুন বিশ্বের নির্মাতা। যে বিশ্ব ধর্মীয় অথবা বস্তুবাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত। যে বিশ্ব বৃহত্তর আদর্শের জন্য সম্পূর্ণ সত্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। তোমরা অতীত অথবা বর্তমানের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্য আত্মোৎসর্গ করবে। সকল নীচতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধে উঠতে হবে তোমাদের।

তোমরা নিজেদের এবং সর্বোপরি সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করবে এবং স্বদেশ ও সমগ্র মানব সমাজের জন্য অবিশ্রান্ত কাজ করে যাবে। বিভ্রান্ত বিশ্বের বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে নব মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে, আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী তোমরা হবে তার পতাকাবাহী। অধঃপতিত ভারতেরও তোমরা পরিবর্তন সাধন করবে।

প্রথমে তোমাদের হতে হবে মনেপ্রাণে ভারতীয়। ইউরোপীয় ভাবধারার আপাত-মধুর প্রলোভনে মুগ্ধ হলে চলবে না। তোমাদের পূর্বপুরুষদের সুমহান চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হও। আর্যের চিন্তা, আর্যের শৃঙ্খলা, আর্যের চরিত্র ও আর্যের জীবনচর্যার পুনরুদ্ধার ও পূর্ণ অনুসরণ কর। বেদান্ত, গীতা ও যোগ অনুসরণ কর। কেবল বাক্যে, বুদ্ধিতে ও মনোভাবে প্রকাশ করলে চলবে না। দৈনন্দিন জীবনচর্যায় তার প্রতিফলন প্রয়োজন। ভারতীয়ভাবে জীবনযাপন করলেই তোমরা মহান, বিরাট শক্তিধর, অজেয় ও নির্ভীক হতে পারবে। জীবন-মৃত্যুর ভয় তোমরা করবে না। অসুবিধা ও অসম্ভবতা প্রভৃতি কথা তোমাদের অভিধানে থাকবে না। আধ্যাত্মিকতাই শক্তির চিরন্তন উৎস। এই শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই।

## ছাত্রদের প্রতি সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে—দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা। দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র কামনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্র-জীবনেই করিতে হইবে

স্কুলে, কলেজে, ঘরে, বাইরে, পথে, ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া বাধা দাও—মুহূর্তের মধ্যে বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রত্যেক ছাত্রেরই বল ও স্বাস্থ্য, উন্নত চরিত্র এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আদর্শ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।···ছাত্রদের কল্যাণের জন্য ব্যায়ামসমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, আলোচনা সমিতি, মাসিকপত্র পরিচালনা, সঙ্গীতসমাজ, পাঠাগার, সমাজকল্যাণ সংঘ ইত্যাদি স্থাপনা করিতে হইবে।

ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে, চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে।

ছাত্রবন্ধুগণ! তোমাদের মধ্যে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহার সংবাদ তোমরা না রাখিলেও আমি রাখি। তোমাদের আত্মবিস্মৃতি যে দিন ঘুচিবে, তোমরা আত্মবিশ্বাস যে দিন ফিরিয়া পাইবে, সাধনার দ্বারা তোমরা যেদিন মরণজয়ী হইবে, সেদিন তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে।

হে বাংলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ, তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে—অনন্ত, অপরিসীম শক্তি। এই শক্তির উদ্বোধন কর।

বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই তো দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। তোমাদের শৌর্য, বীর্য ও চরিত্র দেখে মাতা বসুন্ধরা তোমাদের শুভ্র ললাটে জয়-টীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে।